ইচ্ছামতী

বর্ষা-শরৎ
যুগ্ম সংখ্যা ২০১২

সূচীপত্র

প্রথম পাতা....................1
উৎসবের ছবি....................3
ইচ্ছেমতন....................9
মজার পাতা....................14
বর্ষার আড্ডা....................16
বাহন সংবাদ....................18
ছড়া-কবিতা....................25
পুজো এলেই 25
কালবৈশাখী....................26
আমি হতে চাই....................27
কেউ নেই....................29
খিচুড়ি....................30
ছোট্ট পাখির গল্প....................31
তিনে তখন বনগাঁ লোকাল....................32
সংশয়ের বর্ষা....................33
মা....................34
বেড়াল ও কাঠবেড়ালী....................36
স্পেশাল ক্লাস 39
পরোপকার....................40
গল্প-স্বল্প....................41
আমার পুজো....................41
পাপাঙ্গুল আর অনিফিশ -পর্ব ২....................44
ভূতোর ভূত....................47
মেডেল নিলেন না নন্দপিসি....................52
অতি কৌতুহলের ফল....................58
আনমনে: বুলু পুকুরে যাও....................60
ধারাবাহিক: মেঘ-বৃষ্টির দেশে... (পর্ব-১)....................65
বইপোকার দপ্তর: চিরকালের সেরা-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর....................69
বিদেশী-রূপকথা: গম্ভীর রানীর গল্প....................70
পুরাণকথা: কুসুম আর শী-দের গল্প....................73
স্বাধীনতার গল্প: ওয়াহাবি-ফরাজী আন্দোলন....................79
বায়োস্কোপের বারোকথা: সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্প....................82
ছবির খবর: মুক্তধারা....................84

দেশে-বিদেশে..87
দেবভূমি উত্তরাখন্ড (২)..87
মজার শহর নিউ অর্লিন্স..93
পরশমণি: স্থির তড়িতের কথা..105
জানা-অজানা: প্রাণী জগতের খবরাখবর..108
এক্কা-দোক্কা: অলিম্পিকে ভারতের নক্ষত্ররা..112

প্রথম পাতা

আমার যে একটা চরকা আছে, সে তো জান নিশ্চই। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটি লক্ষরঙা সুতো,আর সেই সব সুতো মিলিয়ে মিশিয়ে, কখনো বুনে, কখনো সেলাই করে, কখনো বা হাত পেঁচিয়ে তৈরি হয় যত রাজ্যের গল্পকথা আর রংবাহারী ছবি, যা দিয়ে সেজে ওঠে ইচ্ছামতী। কিন্তু কিছুদিন আগে সেই চরকাটা হটাৎ করে ভেঙে গেল কিনা, তাই ইচ্ছামতীর বর্ষা সংখ্যা ঠিক সময়মত প্রকাশই করতে পারলাম না। ইচ্ছামতীর তো তাতে বেজায় মন খারাপ, সাথে আমারও।

এদিকে দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে গেল, আকাশ সেজে উঠল উৎসব উৎসব রঙে, বাতাস মেখে নিল পুজো পুজো সুবাস। তখন ঠিক করলাম, এইবার এক সাথে প্রকাশ করা হবে বর্ষা-শরৎ যুগ্ম সংখ্যা। বর্ষা সংখ্যাকে সাজানোর জন্য পেয়েছিলাম কত ছড়া-গল্প; সেগুলির সাথে নতুন করে পাওয়া ছড়া-গল্প-রচনার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি হবে এই যুগ্ম সংখ্যা।

চরকা তো কোনমতে ঠিক হল, আবার চলতেও শুরু করল, যদিও বেশ ধীরে ধীরে। এইবার নেহাত কিনা তিথি নক্ষত্র মেনে মা-দুগ্গার আসতে আসতে প্রায় হেমন্তকাল এসে পড়ল, তাই আমরাও বেশ খানিকটা বেশি সময় পেয়ে গেলাম ধীরে ধীরে কাজ করেও মোটামুটি সময়মত যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশের জন্য। এর জন্য মা দুগ্গার একটা বড় ধন্যবাদ পাওনা।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলতেই হয়।ইচ্ছামতীর শ্রদ্ধেয় লেখকেরা কিনা বড়ই ভালো, বড়ই বুঝদার, তাই বর্ষা সংখ্যা সময় মত প্রকাশ না হওয়াতেও তাঁরা একফোঁটাও রেগে যান নি; ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছেন বর্ষা-শরৎ যুগ্ম সংখ্যার জন্য। তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আর ইচ্ছামতীর পাঠক? তুমি এই কয়েক মাসের মধ্যে ইচ্ছামতীকে ভুলে যাওনি তো? আমি জানি, ইচ্ছামতীও জানে, তুমি ভুলতে পার না। তুমিও ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলে, তাই না? আর তাই, তোমাকেও জানাই ইচ্ছামতীর পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা।

যাইহোক, অনেক চেষ্টা করেও, শেষ অবধি ইচ্ছামতীর বর্ষা- শরৎ যুগ্ম সংখ্যা ২০১২ প্রকাশ হতে হতে ষষ্ঠীর বেলা শেষ হয়েই গেল। একদম শেষ মূহুর্তে ইচ্ছামতীকে সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন ইচ্ছামতীর বন্ধু অনন্যা দত্ত, দেবকুমার বেরা, কৌস্তুভ রায়, চন্দনা রায় ও রজত নারায়ণ। তাঁদের সবাইকে ইচ্ছামতী জানায় শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আর বেশি কথা বাড়াব না। তোমার পুজো ভাল কাটুক। ইচ্ছামতীর তরফ থেকে এই উৎসবের মরসুমে, তোমার জন্য রইল-

মাঠ ভরা ধান,
মন ভোলানো গান,
নদী ভরা জল,
মায়ের আঁচল,

শিউলি-পদ্ম-দোপাটি,
শিশিরধোয়া মাটি,
ঝকঝকে নীল আকাশ,
পালক সাদা কাশ,
রামধনু রঙ আশা,
অনেক ভালবাসা।

ভাল থেক।

চাঁদের বুড়ি
মহাষষ্ঠী,
শনিবার,
৩ রা কার্তিক, ১৮১৯
২০শে অক্টোবর, ২০১২

<u>উৎসবের ছবি</u>

এই উৎসবের মরসুমে, ইচ্ছামতী তার বন্ধুদের কাছে চেয়েছিল উৎসবের ছবি। এই পাতায় রইল পূব-পশ্চিম থেকে পাঠানো ইচ্ছামতীর বন্ধুদের আঁকা উৎসবের সেই সব ছবি।

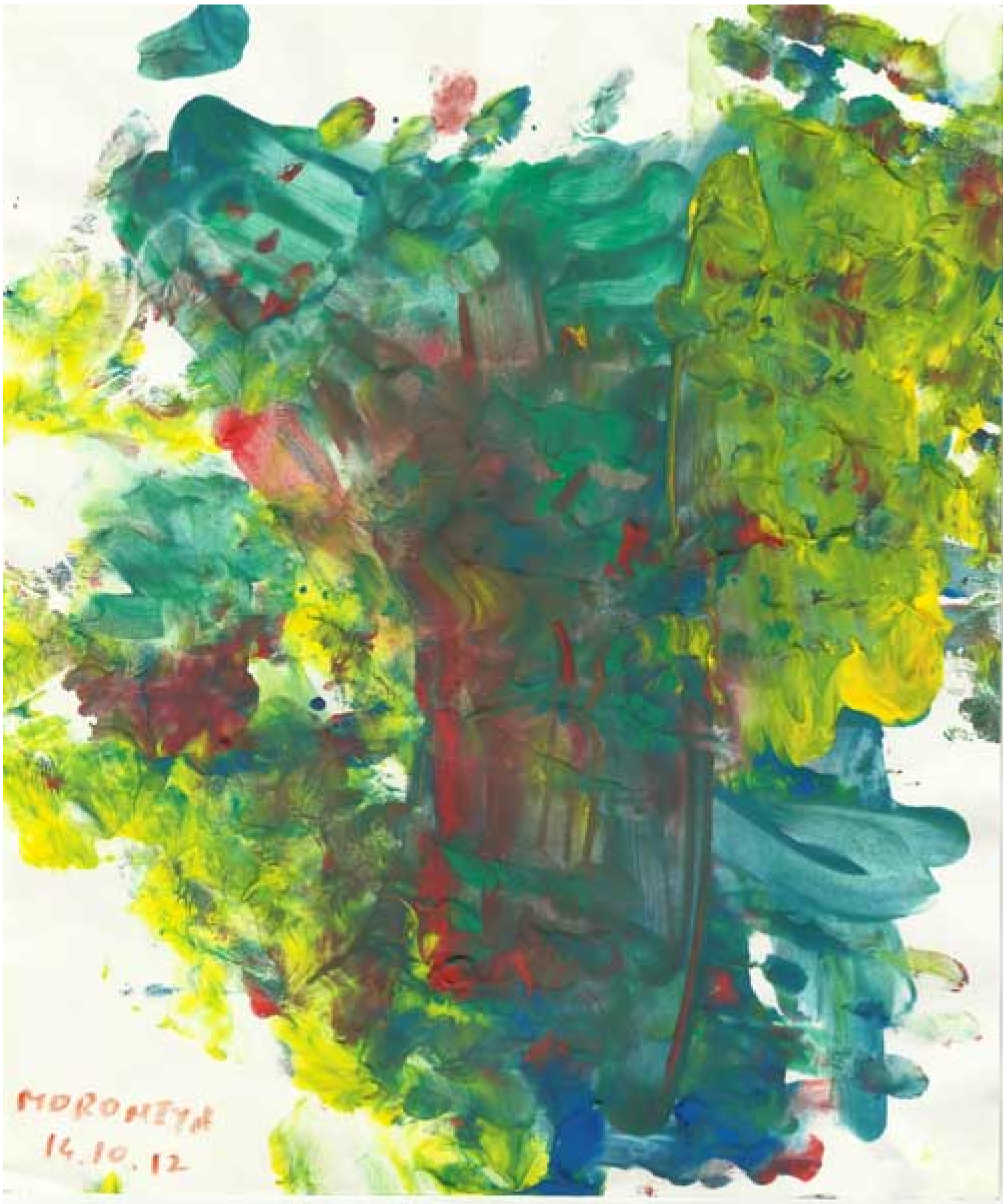

কলকাতা থেকে তিন বছরের ছোট্ট মরমিয়া মুখার্জি মনের আনন্দে নানা রঙে সাজিয়ে তুলেছে উৎসবের এই ছবি।

কলকাতার বি.ডি.এম ইন্টারন্যাশ্‌নাল স্কুলের সুদীপা কুজুর এঁকেছে গণেশ পুজোর ছবি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া থেকে সাড়ে চার বছরের কণাদ মন্ডল এঁকেছে তার বাড়ির পাশের কাশফুলের ছবি, নীল আকাশে সাদা মেঘ আর সাথে দুর্গাপুজোর ছবি।

জমজমাট দুর্গাপুজোর ছবি এঁকেছে কলকাতার বিড়লা হাই স্কুল ফর বয়েজ এর সৌম্যদীপ চ্যাটার্জি।

চিত্তরঞ্জন, বর্ধমানের সেন্ট জোসেফ'স কনভেন্ট হাই স্কুলের উজ্জয়িনী বিশ্বাস এঁকেছে লক্ষ্মী পুজোর ছবি।

প্লাইমাউথ, মিনেসোটা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে হ্যালোউইনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে Anika Lynn Austvold।

ইচ্ছেমতন

এই সংখ্যা থেকে ইচ্ছামতীর বন্ধুদের ইচ্ছেমতন আঁকা ছবি আর লেখা আসবে 'ইচ্ছেমতন' বিভাগেঃ

কৃত্তিকা সেনগুপ্ত,
দ্বিতীয় শ্রেণী, দিল্লি পাবলিক স্কুল, হোয়াইটফিল্ড, ব্যাঙ্গালোর

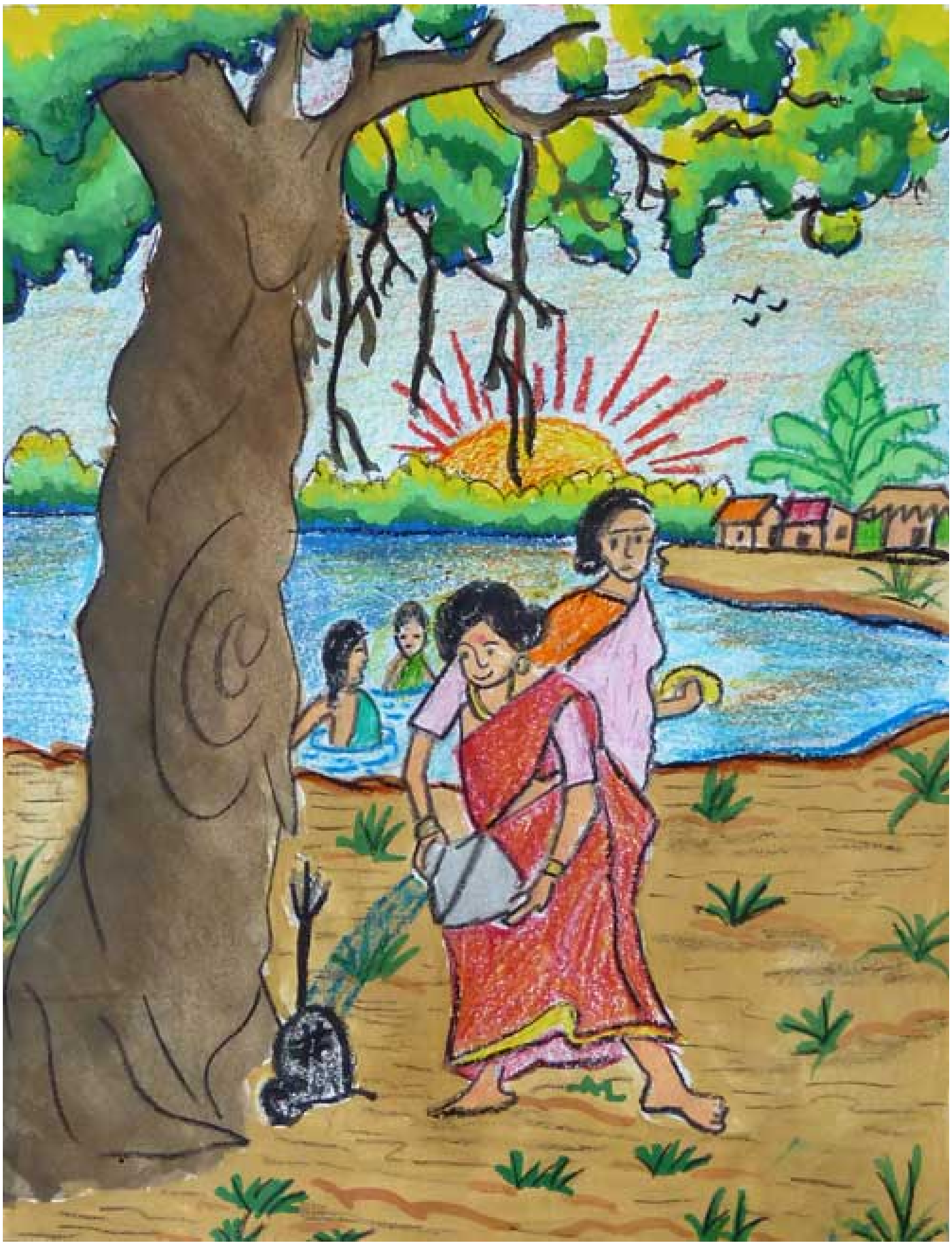

মধুরিমা গোস্বামী,
অষ্টম শ্রেণী, দ্য ভবানীপুর গুজরাটি এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, কলকাতা

মালিকা দত্ত,
সপ্তম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা

নীলাগ্নি দাস,
তৃতীয় শ্রেণী, বি.ডি.এম ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা

অমিতৌজা ঐশী বসু,
তৃতীয় শ্রেণী, ফার্মিংটন উড়স্ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালরিয়েট এলিমেন্টারি স্কুল, কেরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

<u>মজার পাতা</u>

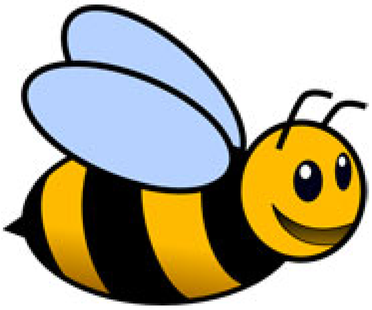

তল্ক. তুমি পাবে তার, সেটা জেনো ঠিক,
যদি মাথা যায় ছাঁটা,
তিনে মিলে পাত্র হবে বেশ ভালো এক,
মুকুল, গেলে পেট কাটা

২. কম হবে শেষ ছাড়া, যন্ত্র মধ্য বিহনে,
তিনেতে সুন্দর রূপ, পূজায় সবে আনে

৩. শুরু ছাড়া অনাত্মীয়, শেষ ছাড়া চার
মাছ ধরিতে গেলে,
তিনে লাগে বিবাহেতে, শ্বেত বর্ণ তার
বলো, নাম খুঁজে পেলে?

৪. রামায়ণ পড় যদি, নাম তার পাবে
চারটি অক্ষর,
প্রথম দুইয়েতে কুলো, নিশাচরী ভাবে
করি স্বয়ংবর

৫. ধাঁধা যদি সোজা লাগে, সরল তা নয়
কঠিন ও হবে না,
আগে পিছে তল পাবে, তিনে নিরাকৃতি
দেখো পারো কি না?

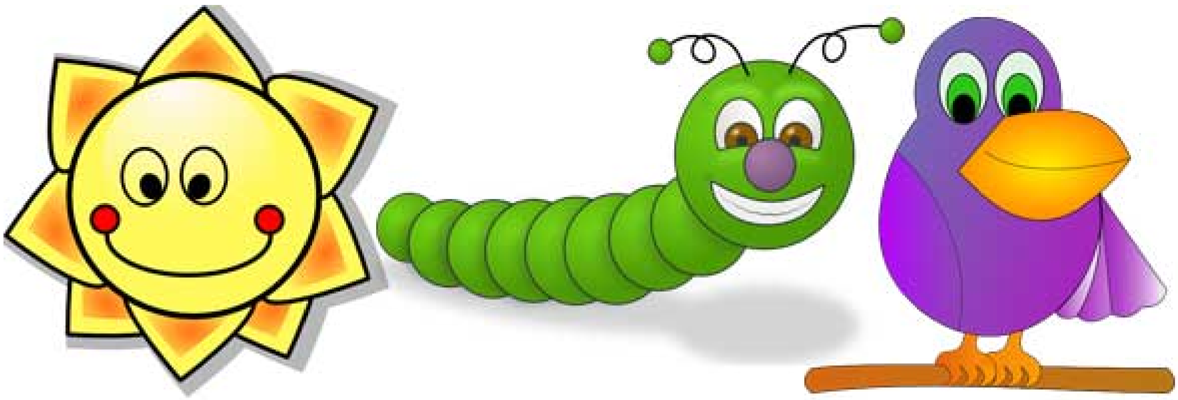

উত্তর মালা:

১. বোতল

২. কমল

৩. টোপর

৪. সূর্পনখা

৫. তরল

অধ্যাপক (ড:) জি. সি. ভট্টাচার্য,
বারাণসী, উত্তর প্রদেশ

বর্ষার আড্ডা

আবার মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখন চলবে কিছুক্ষণ। তেলেভাজার অর্ডার দিলো ভুডুলমামা। আই-ফোনটা টেবিলে রেখে, সোফায় গা এলিয়ে ভুডুলমামা টিভিটা খুলে দিলো। মা বলে, 'এল সি ডি স্ক্রিনে'র আলো - 'এল সি ডি স্ক্রিনে'র বাংলা কি 'তরল স্ফটিক প্রদর্শন পর্দা'? যাই হোক - তার আলো চোখের রেটিনায় ধরা পড়লেই টিকলির আর আমার মাথাটা নাকি সেদিকে ঘুরে যায়। তাই হল। টিভিতে প্রোগ্রাম, 'রিফ্লেকসন'। পর্দায় চলছে দুই নেতার মধ্যে ... একে কি তর্ক-বিতর্ক বলা যায়? বেচারা 'হোস্ট্' কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। না! আর দেখা যায় না! ভুডুলমামা রিমোটের বোতাম টিপল।

ভুডুলমামা একটু অদ্ভুত লাগবে শুনতে।
তবুও -
বলতো দেখি, ভেবে চিন্তে।

হায়েনা।
হ্যাংলা, জিব তার
ঝোলে মুখ থেকে বেড়িয়ে।
আয়নায় দেখে তা
লজ্জায় মুখটাকে
কেন ফেলে না সে লুকিয়ে?

গিরগিটি।
হরদম রঙ সে তার

বাদলায়।
শকিল হয় কি
চিনতে নিজেকে,
যখন প্রতিচ্ছবি
ধরা পড়ে আয়নায়?

বাদুর।
রক্ত চোষে, কদাকার।
অন্য কিছুই
মুখে তার রোচে না।
আয়নায় দেখে নিজেকে,
আতঙ্কে মূর্ছা
কেন সে যায় না?

বিছে।
বিষাক্ত দাঁড়া
সর্বদা উঁচিয়ে।
হঠাৎ দেখে যদি নিজেকে
আয়নার পিছনে
বুকটা কি কাঁপে তার,
সটকান -
দাঁড়াটা নামিয়ে?

টিকলি জঙ্গলেতে আয়না!
কোথায় পাবে হায়েনা?
তাছাড়া - ওরা বন্য।
তবে, [একটু ভেবে] সহজ নয় উত্তর।
আসল প্রশ্নটা যে অন্য।

এই মুহূর্তে ভুডুলমামার মোটা গোঁফে তলায় একটা হাসি কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। টিকলির দিকে তাকায়, উত্তর দেয় না। দরজায় ঘন্টা। নিশ্চয় গরমা-গরম ডেলিভারি নিয়ে হাজির তেলেভাজার দোকানের ঘেঁটু। ভুডুলমামা পকেট থেকে 'ওয়ালেট'টা বার কারে আমার দিকে ছুড়ে দেয়।

শিব শঙ্কর বসু,
এপেক্স, নর্থ ক্যারোলাইনা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

বাহন সংবাদ

দুর্গাপুজোর হইচই শুরু হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় নানাধরণের মন্ডপ, হরেক রকম আলোকসজ্জা, বিভিন্ন ধরণের থিমে সেজে উঠছে পুজো মন্ডপগুলি। তবে থিম যাই হোক না কেন, একটা আদত থিমের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়না। কোনটা বলব? সেই থিমটা হল ছেলে-মেয়ে সহ মা দুর্গার বাহনের থিম। মন্ডপে মন্ডপে মায়ের সাজ সজ্জা বদলে যায়, ভাব বদলে যায় - কোথাও তিনি অসুরদলনী, কোথাও বা তিনি জগজ্জননী - কিন্তু পায়ের কাছে তাঁর সবসময়েই বাহন সিংহ। ঠিক যেমন লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর রাজহাঁস, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, শিবের ষাঁড়... হিন্দু পুরাণে, সমস্ত দেবদেবীরই একজন করে বাহন আছে। অনেক সময়ে সেই দেব বা দেবীর বাহনের সদর্থক গুণগুলি সেই দেবতার প্রতীকের মত হয়। যেমন শিবের বাহন ষাঁড়, শক্তি এবং পৌরুষের প্রতীক।

এই বাহন পশু বা পাখীর আরো একটা জিনিষের প্রতীক। এগুলি সেই সব দোষের প্রতীক, যেগুলিকে প্রতি দেব বা দেবী পরাস্ত করতে চান।

তাহলে দেখে নেওয়া যাক, আমাদের পরিচিত বাহনেরা কে কিসের প্রতীক।

প্যাঁচাঃ

দেবী লক্ষ্মীর বাহন। লক্ষ্মী ধন ও প্রাচুর্যের দেবী। কোন কোন অঞ্চলে, প্যাঁচাকে বুদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রতীক ভাবা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই, প্যাঁচা হল অন্ধকার এবং অলক্ষ্মী অ দুর্ভাগ্যের প্রতীক। লক্ষ্মীর দেওয়া ধন সম্পদের মোহে মানুষের অসৎ এবং লোভী হয়ে ওঠার প্রতীক প্যাঁচা হয়ে ওঠে লক্ষ্মীর বাহন।

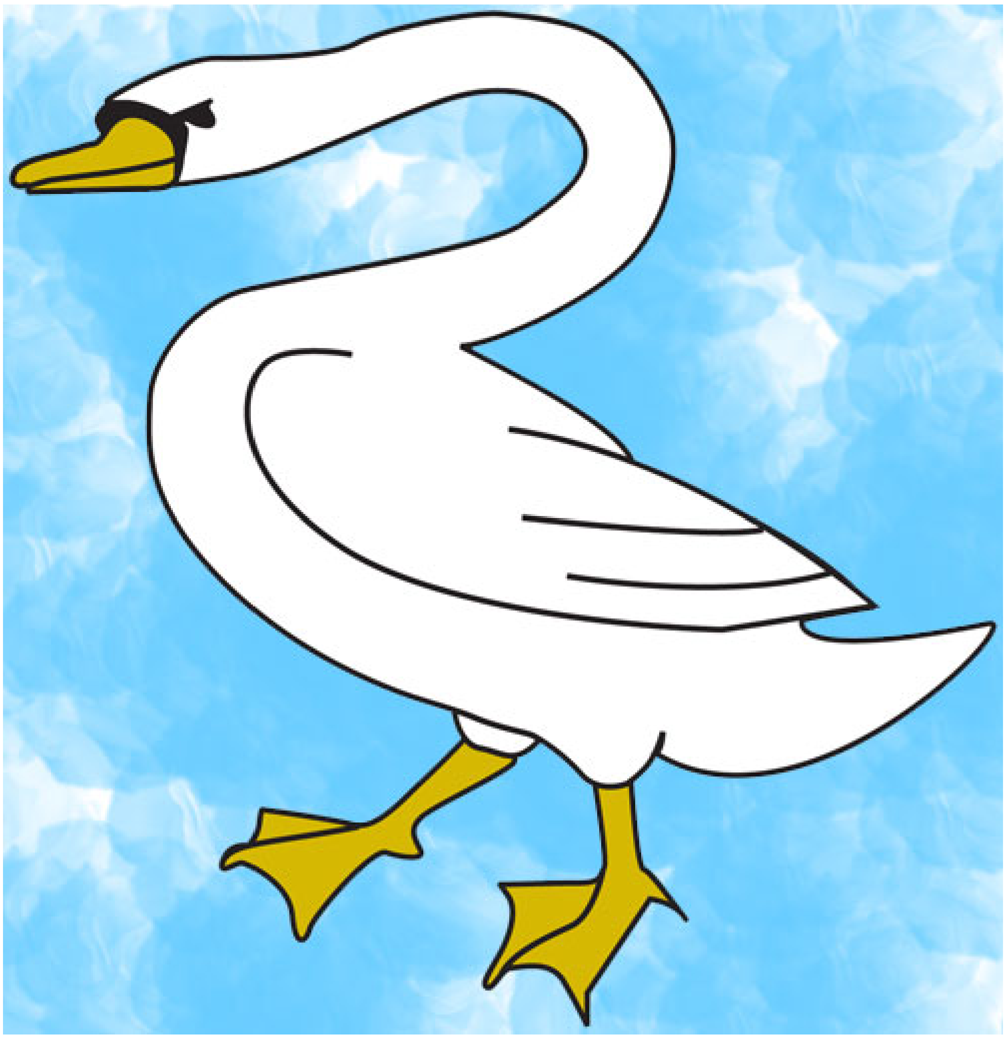

রাজহাঁসঃ

দেবী সরস্বতীর বাহন। বলা হয়, রাজহাঁস জল আর দুধের মিশ্রণ থেকে দুধ আলাদা করে নিতে পারে। এই সূক্ষ্ম প্রভেদ ক্ষমতা রাজহাঁসকে করে তোলে সৃষ্টিশীলতা আর জ্ঞানের প্রতীক।তার গায়ের সাদা রঙ শ্রেষ্ঠতার প্রতীক।

ইঁদুরঃ

গণেশ ঠাকুরের বাহন। ইঁদুর হল লোভের প্রতীক- সে যা দেখে তাই খেতে চায়, সব জিনিষ কেটে নষ্ট করে। গণেশ আমাদের চরিত্রের এই দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের লোভ এবং ধ্বংস করার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যেই ইঁদুর হয়ে ওঠে গণেশের বাহন।

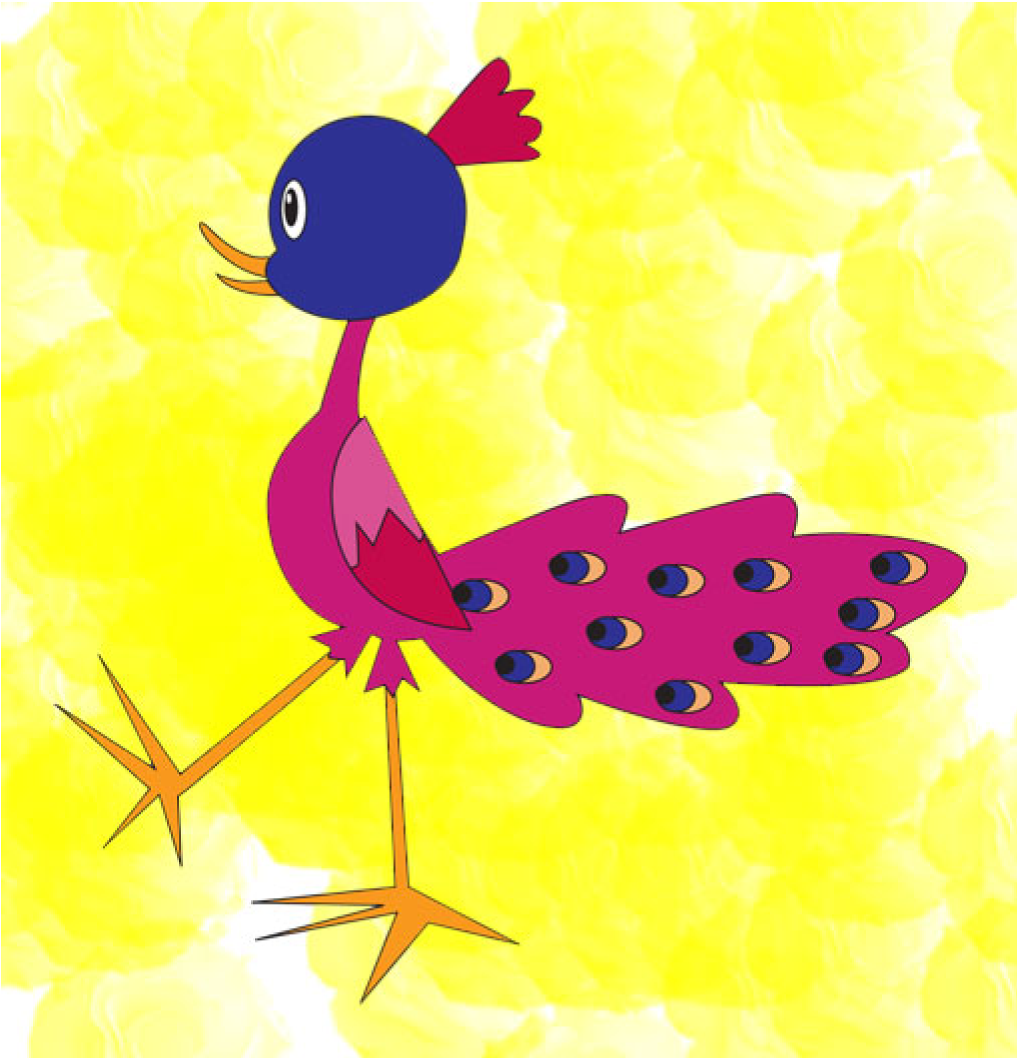

ময়ূরঃ

ময়ূর কার্তিকের বাহন। ময়ুর তার রূপ নিয়ে অসম্ভব গর্বিত – যা আসলে তার একটা দোষ। তাই ময়ূর কার্তিকের পদতলে থাকে। তিনি আমাদের আত্মঅহঙ্কার থেকে মুক্তি দিতে চান। সদর্থক ভাবে দেখতে গেলে, ময়ূরের এই গর্ব ঈশ্বরের আরাধনায় বিশ্বাসী ভক্তের গর্ব।

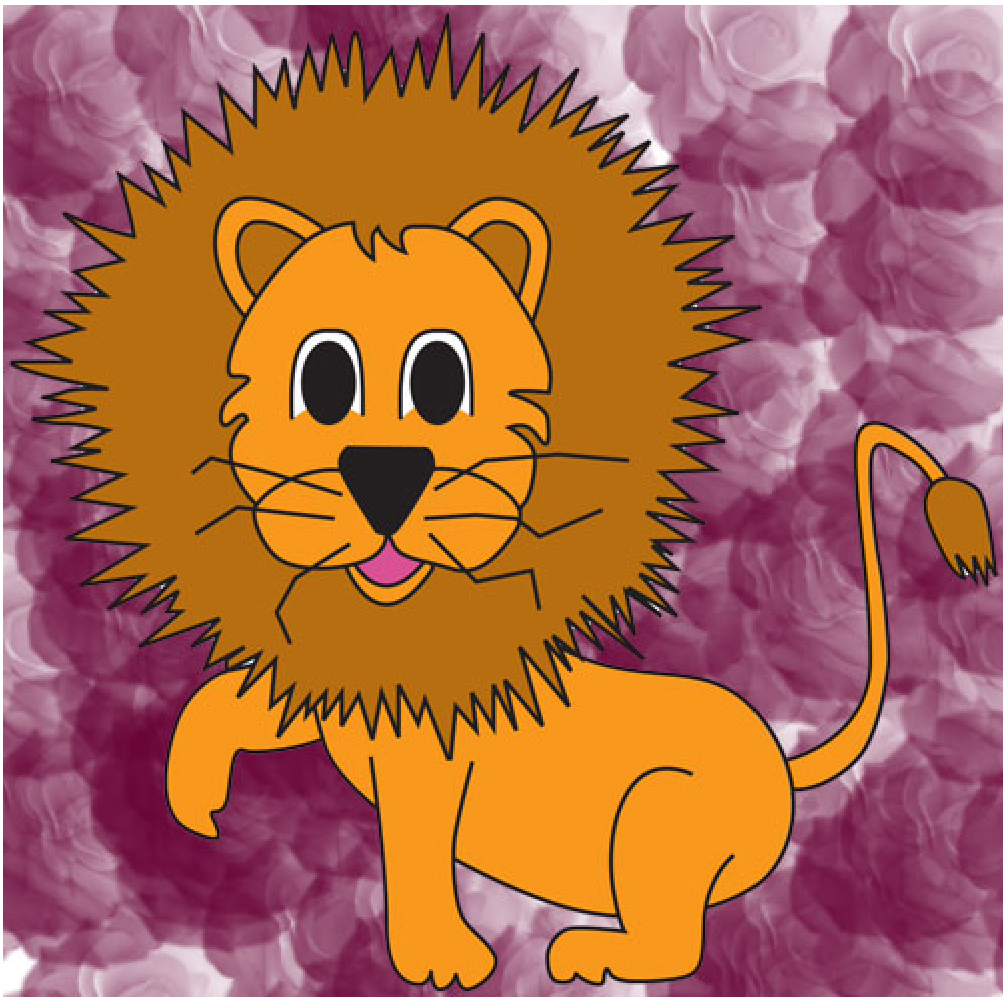

সিংহ ঃ

দেবী দুর্গার বাহন, যাকে ছাড়া দেবীর সাজ অসম্পূর্ণ। পুরাণ মতে, দুর্গা যখন মহিষাসুরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন হিমালয় তাঁকে বাহন রূপে এক সাদা সিংহ দেন। আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করার জন্য সিংহ শক্তি এবং যুদ্ধকৌশলের প্রতীক।অন্যদিকে, সিংহ পশুদের মধ্যে সেরা। সে আবার লোভ, লালসা এবং মোহেরও প্রতীক। সিংহবাহিনী দুর্গা মানুষের মধ্যে এইসব পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সিংহ যদিও মা দুর্গার বাহন, কিন্তু লোককথা মতে মা দুর্গা কৈলাশ থেকে বাপের বাড়ি আসা এবং যাওয়ার সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতি, ঘোড়া, দোলা আর নৌকা ব্যবহার করেন। একেকটির ব্যবহারে পৃথিবীর ওপর একেক রকমের প্রভাব পড়ে। মা এইবার হাতির পিঠে চেপে এসেছেন, তার ফল -শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। ফিরে যাবেন নৌকা চেপে। তার ফল- শস্যবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

ছবিঃ
দেবকুমার বেরা
চন্দনা রায়

ছড়া-কবিতা

পুজো এলেই ...

পুজো এলেই আমার চোখে বাড়ির গলি
সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত মায়ের মুখ
সাদা-কালো-আঁধার-আলো শহরতলি
ঢাকের বোলে গভীর সুখে নাচছে বুক

পুজো এলেই আমার দুচোখ জুড়ে নদী
শিউলি উঠান,তুলসীতলা,কাশের বন
অমলকাকা, বুয়াপিসি,বুরানদিদি
চেনা মুখের সহজ হাসি সবুজ মন

পুজো এলেই আমার চোখে পাড়ার দোকান
শিবমন্দির,বটতলা, জয়জগন্নাথ
পুজো এলেই আমার বুকে আনন্দ গান
মায়ের হাতে ঘি মাখানো গরম ভাত

পুজো এলেই আমার চোখে বাড়ির গলি
পড়ার টেবিল, খেলার পুতুল,আমার ঘর
পুজো এলেই আগমনী গানের কলি
বাবার গলা,"আসবি তো মা এই বছর?"

লেখা ও ছবিঃ
দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

কালবৈশাখী

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি
 মেঘের উপর মেঘ
তারই সাথে বাড়ছে হাওয়ার
 বেগের উপর বেগ।
এই বুঝি বা আকাশ ভেঙে
 পড়বে এবার ঘাড়ে
সবুজপ্রাণে অবুঝপ্রাণে
 শঙ্কা ততই বাড়ে।
লক্ষ মশাল জ্বললো উঠে
 চক্ষু মেলা দায়
লক্ষ ঢাকের আওয়াজেতে
 কান পাতা না যায়।
বৃক্ষগুলি পড়ছে ভেঙে
 মড়-মড়া-মড়-মড়াৎ
বজ্রপাতের শব্দ শুনি
 কড়-কড়া-কড় কড়াৎ।
পক্ষী-পশু-মানব-শিশু
 ভয়েই জড়সড়
বৃষ্টি পড়ে শিলাসহ
 বাপরে কত বড়!

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

আমি হতে চাই

পিকলু বলল হতে চাই আমি
বড় হলে এক ইঞ্জিনীয়ার
এই পৃথিবীতে তোমরাই বল
আছে এত ভালো চাকরি কি আর?

বলল বুবাই ভালো হবে যদি
হতে পারি কোনো বিমান চালক
পারবেনা কেউ বলতে তাহলে
আমি হাবা গোবা মুখ্যু বালক.

বুকটি ফুলিয়ে বিল্টু বলল
আমি হব কোনো বড় ব্যবসায়ী
ধন্য ধন্য করবে সবাই
টাটা বিড়লারা হবে ধরাশায়ী.

পুপলু বলল ভালই লাগবে
সীমান্তে যদি হই সৈনিক
প্রতিপক্ষ কে মেরেই ভাগাবো
হোক পাক সেনা নয় চৈনিক.

আমি হতে চাই বলল তাতাই
বলিউডি কোনো চিত্র তারকা
আমার নামেই হবে আলোড়িত
বম্বে, দিল্লি, শিলং, দ্বারকা.

মন্টু বলল দাদুর মতই
হব একদিন স্কুল মাস্টার
সঙ্গীরা হবে ছাত্র,ছাত্রী,
পেন, খাতা, বই, চক, ডাস্টার।

তন্ময় দাশ
ভদোদরা, গুজরাট

কেউ নেই

গায়ে জামা নেই
পায়ে চটি নেই
তেল নেই তোর চুলেতে,
কেউ আগে নেই
কেউ পিছে নেই
কেউ নেই তিন কুলেতে।

এসে বলে তাই
দুটো খেতে চাই
তবু দিই তোরে তাড়িয়ে,
কেউ কাছে এসে
তোরে ভালবেসে
দি নাতো হাত বাড়িয়ে।

লেখাঃ
তরুণ কুমার সরখেল
আমডিহা, পুরুলিয়া

ছবিঃ
অবি সরকার
আমডিহা, পুরুলিয়া

খিচুড়ি

বৃষ্টি-ভেজা দিনের বেলায়
খিচুড়ি যে খায়না,
তার সাথে কথা নেই
শুনবোনা বায়না!
দিন-ভর বৃষ্টিতে
উঠোনেতে হাঁটু জল,
কোলাব্যাং ডেকে যায়
ছেলেদের কোলাহল-
আজ বুঝি 'রেনি-ডে'?
স্কুল তাই বন্ধ?
জলেতেই খেলা চলে
প্রাণে কি আনন্দ।
গুরু গুরু মেঘ ডাকে
শন শন হাওয়া বয়।
বাঁশ ঝাড়ে যেন কারা
ফিস ফিস কথা কয়।
তাই বলি দেরী কেন
দিনেতেই সন্ধে
মন বুঝি নাচে নাকো
খিচুড়ির গন্ধে!
চটপট বসে পড়ো
সাথে আছে ভাজা ডিম
মাথা খাও কথা রাখো
বৃষ্টিতে রিম ঝিম।

সমর চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা

ছোট্ট পাখির গল্প

কাগজফুলের গাছে,
রঙিন পাতার কাছে-
একটা ছোট্ট পাখি
করে ডাকাডাকি;
কাছে থেকে দূরে,
বেড়ায় উড়ে উড়ে,
সন্ধ্যাবেলা শেষে,
ঘরে ফিরে আসে।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

তিনে তখন বনগাঁ লোকাল

ইস্টিশনে আসছে গাড়ি, সব দিয়েছে ছুট;
উঠতে হবে ঠেলেঠুলে, ভীড়ে ঠাসা ধুত!
কেউ বা আবার ভেবেছিল, আসবে গাড়ি দু'য়ে;
ধড়ফড়িয়ে ছুট লাগাল, মাইকে বলা শুনে।
ওভারব্রীজটা পড়েই আছে, নিজের মতো একা;
রিস্ক নিয়ে সব যাচ্ছে হেঁটে, লাইন দেখে ফাঁকা!
হাঁটছে সবাই এর-ওর দেখে, নেইকো মনে ভয়;
সময়খানা অনেক দামী, জীবনখানা নয়!
কানে গুঁজেই চলছে হেঁটে, শুনছে বোধহয় গান-
আনমনা হয়ে সবার পিছে, একটা সবুজ প্রাণ।
তিনে তখন বনগাঁ লোকাল, ছুটছে ভীষণ জোরে;
আপনমনে হাঁটছে বুবুন, হাঁটছে নিজের ঘোরে।
টের বুঝি সে পেল এবার, চারদিকে শোরগোল-
ঘাড় ঘুরিয়ে বনগাঁ লোকাল! বাজছে মায়ের ফোন।
ট্রেনটা থেমে!! স্বপ্ন, না কি সত্যি আছি বেঁচে!
ভীষণ জোরে ব্রেক কষেছে, চালক তাকে দেখে।
অঝোরধারায় কাঁদছে বুবুন, নতুন জীবন যেন;
"এমন ভুল আর কোনদিনও, করব না কক্ষণও।"

মধুমিতা প্রামাণিক
গিরীশ পার্ক, কলকাতা

সংশয়ের বর্ষা

আকাশে দামিনী চমকায়,
ঘরে সুইচ-অফ করো টি-ভি।
দমকা হাওয়াটা আয়লা নয় তো?
কেঁপে ওঠে বনবিবি।

ওড়ে যদি ঝড়ে ঝরাপাতা
তবে ঘরে বিদ্যুৎ বন্ধ।
স্বস্তিধারায় চলবে তো ট্রেন?
তাই নিয়ে মনে ধন্দ।

চাতক মাটির মিটিয়ে তৃষ্ণা
পথে কি নৌকো নামবে?
সবুজ আনাজে উপচানো ট্রাক
রাস্তার ধসে থামবে?

হ্যানোত্যানো যত সংশয় নিয়ে
বর্ষা আবার আসছে।
টিউশন ফাঁকে তবু খুঁজো
কোথা দুটো বুনোফুল হাসছে।

অনিরুদ্ধ সেন
থানে, মহারাষ্ট্র

মা

নেইকো ঘর, নেইকো বাড়ি ;
রাস্তাঘাটেই চাপাই হাঁড়ি।
পাশ দিয়ে যায়, কত গাড়ি ;
এদিক ওদিক এলোপাথাড়ি।
" ও মা ও যে দৌড়ে গেল ---
ধর না ছুটে, কী যে হল!! "
" এই নাও গো, তোমার ছেলে "
ছোট্ট শিশু, মায়ের কোলে।
এমনি করেই দিন কেটে যায়,
আজ তো গেল, কাল যে কি হয়।
ভাববো এমন সময় কোথায়?
ভিক্ষা করেই, দিন কেটে যায়।
পশ্চিমেতে সুয্যি ডোবে,
ক্লান্ত পাখি, বাসায় ফেরে।
রাস্তাঘাটে জ্বললো আলো,
মেঘ করেছে, বড্ড কালো।
টিপটিপটিপ বৃষ্টি পড়ে,
মনটা আমার গুমরে মরে।
খানিক বাদেই উঠলো যে ঝড়,
কী যে করি, হায় ঈশ্বর!!
কোথায় যাব বসে ভাবি,
জলের ফোঁটা, কাঁদছি আমি।
চারদিকেতে জল থইথই,
নতুন বাসা কোথায় বানাই!
রাতটা গেল না ঘুমিয়ে,

বসে আছি মুখ শুকিয়ে।
কখন জানি বৃষ্টি থামে,
ভোরের আলো পূবের পাটে।
আরেকটা দিন, আবার লড়াই ;
ভিজে কাপড় উঠে দাঁড়াই।
মা যে আমি, ভরসা ওদের ;
ওই দেখা যায় ঝলক রোদের।।

মধুমিতা প্রামাণিক
গিরীশ পার্ক, কলকাতা

বেড়াল ও কাঠবেড়ালী

বেড়াল:
কাঠবেড়ালী,পোড়া কপাল,
সুখ কোথা বল তোর!
তোর দুঃখে পরাণ ফাটে--
তুই দুখী বড় ঘোর!

কাঠবেড়ালী:
ভাই,আমার জন্যে দুঃখ কেন এত?
আমি আছি তো বেশ--
হাসছি,খেলছি,ঘুরছি,ফিরছি--
মনে নেই কো ক্লেশ।

বেড়াল:
ঘুরে তো বেড়াস বাইরের বনে
ভয়ের সে যে রাজ্য,
ঝড়ে,বর্ষায়,ঠাণ্ডা,খরায়
কত যে করিস সহ্য!

কাঠ বেড়ালী:
ভালই আছি,স্বাধীন আছি,
ভয় কিছু তো লাগবেই,
শত্রু,মিত্র,ভালো,মন্দ--
সব কিছু তো থাকবেই!

বেড়াল:
বনেতে জন্তু,বিষধর সাপ--
পারে যে তোকে মারতে,
আমি নিরাপদ,নেই কো বিপদ,
কখনো চাই না হারতে।

কাঠবেড়ালী:
ঘরের বাইরে তোমারও শত্রু
কুকুরের দলবল,
সুযোগ পেলেই খাবে যে কামড়ে,
সেথা তুমি দুর্বল।

বেড়াল:
নিরামিষ আর আমিষ খাদ্যে
জিভে পাই বড় স্বাদ!
ঘরের ইঁদুর,করি সব দূর
কিছুই রাখি না বাদ।

কাঠবেড়ালী:
আমি খাই ফল,আমি খাই ফুল,
বনের লতাপাতা কুটো,
খাদ্য আমিষ,আমার কাছে বিষ
সুখে খাই দুই মুঠো।

বেড়াল:
আমার মালিকের ফলের গাছের
ফল তুই খুঁটে খাস,
চুপি চুপি চুরি এ কাজ তোরই,
করিস সর্বনাশ।

কাঠবেড়ালী:
আর,খিদে না পেলেও করো তুমি চুরি--
মাছ কিম্বা দুধ,
ঘরের কর্ত্রী,ভয়ের মূর্তি
পিটিয়ে তোলে সে সুদ।

বেড়াল:
না,না,ছোট বড়,সবাই করে
হাত বুলিয়ে আদর,
কোমল গায়ে আমি,গা ঘেঁষি সবার,
করি ঘড় ঘড় স্বর।

কাঠবেড়ালী:
আমিও খেলি শিশুদের সাথে,
ছোট ছোট লাফে চলি,
কখনো লুকাই পাতার আড়ালে,
লুকোচুরি খেলা খেলি।

বেড়াল: ঠিক আছে,ভাই,ভালো সবাই,
যে আছে যার জায়গায়।

কাঠবেড়ালী: কেউ ছোট নয়,কেউ বড় নয়,
কাজ নেই আর রাগায়।।

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্য প্রদেশ

স্পেশাল ক্লাস

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
 রাস্তা ভাসে জলে
ব্যাংবাবাজী ছাতা মাথায়
 লং জাম্পে চলে।
ঠিক টাইমে না পৌঁছালে
 ফসকাবে 'এ-প্লাস'
'রেনি ডে' তেই 'বিগ-ব্যাং' স্কুল
 নিচ্ছে স্পেশাল ক্লাস!

জ্যোতির্ময় দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পরোপকার

শ্যাওড়া গাছের ব্রহ্মদত্যির গায়ে বড্ড ব্যথা,
নানা দেশের ভূত বদ্যি ভীড় করেছে সেথা।
"গাছের শেকড় ভাল্লাগে না, অন্য কিছু নেই?"
রেগে ওঠেন ব্রহ্মদত্যি, "এমবিবিএস কই?"
হুমদো ভূত ছুটে মরে, এমবিবিএস খোঁজে
অবশেষে না পেয়ে নিজেই সেজে বসে।
এমবিবিএস হুমদো ভূত স্টেথো নিয়ে হাঁটে,
ব্রহ্মদত্যি টের পায় না, শুয়ে থাকে খাটে।
বলে হুমদো স্বর উঁচিয়ে, "কি হয়েছে আপনার?
দশটা দিলাম পেইনকিলার, আসবো পরে আবার।"
ওষুধ খেয়ে ব্রহ্মদত্যির গায়ের ব্যথা সারে,
মনে মনে দারুণ খুশি হয় সে হুমদোর 'পরে।
দুদিন পরে ব্রহ্মদত্যি আবার করে চিৎকার,
"ওরে হুমদো কোথায় গেল তোর আনা সেই ডাক্তার?
আবার হল গায়ে ব্যথা, এ কেমন চিকিৎসে?
ধরে আন তো কানটা টেনে, চড়িয়ে দি কষে!"
হুমদো পালায় লেজ গুটিয়ে নিমগাছের ওই ডালে,
কেটে পড়াই ভাল এবার, নইলে চাঁটি গালে!!

নীনা ঘোষদস্তিদার
খড়্গপুর

গল্প-স্বল্প

আমার পুজো

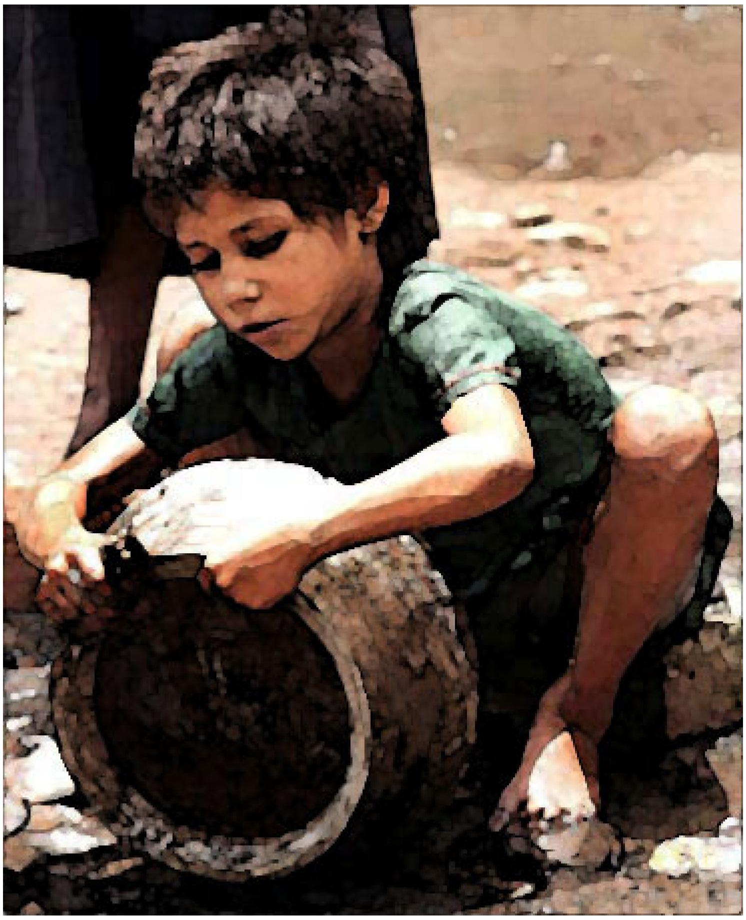

এখন এই মুহূর্তে মালিকের দাঁত খিঁচুনি থেকে রেহাই, নেই খদ্দেরের বকুনি। খসে যাওয়া কালচে ইঁটের দেওয়ালে ছোট্ট খুপরি জানালা। ওই জানালায় রাতের আকাশ, গাছ-গাছালি, দূরে ট্রেন লাইন, বাজার, ঘর-বাড়িগুলো দেখাটুকু এখন আমার স্বাধীনতা। হোটেলের এই জানালার পাশে খাবার টেবিলে পুরানো আলুর বস্তায় আমার রাতের বিছানা। তক্ষুনি রাতের শেষ বারোটা চল্লিশের ডাউন ট্রেনটা ক্লান্ত ধীরে ধীরে ঘ্যাটর ঘ্যাটর শব্দ তুলে চলে গেল না জানি কোন সে স্বপ্নের দেশে!

এদিকে পেছনে রান্নার ঠাকুর হরনাথ ঘড়ুই নাকে নস্যি নিয়ে শুয়ে পড়েছে অনেক্ষন। তার পাশের টেবিলটায় কালু আর পরাণ ঘুমিয়ে কাদা এতক্ষন। চোখ যায় জানালা দিয়ে দূরে স্টেশন লাগোয়া ছাতিম গাছটায়। ওর ছাতার মতো বাহারি চেহারার মধ্যে আস্ত একটা ল্যাম্প-পোস্ট আশ্রয় নিয়েছে নিশ্চিন্তে। তার হলদেটে লালচে ঝিমুনিধরা আলোয় ছাতিমের ঘুম হয়েছে সজাগ। তক্ষুনি একটা হাল্কা দখিনা হাওয়ায় ছাতিম ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল। জানান দিল শরৎ এসেছে। পূজো আসছে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়া মাঝে একটা বাঁশ বাখারির জানালা -- আমার স্বাধীন ঠিকানা। মা বোনকে নিয়ে একপাশে ঘুমোয়, পাশের চাটাইতে আমার নিশ্চিন্ত রূপকথার সজাগ বিছানা। একফালি চাঁদ আর একরাশ তারা নিয়ে নিঝুম আকাশটা জেগে থাকে সে সব রূপকথা শোনার জন্য। ঝিরঝিরে দখিনে হাওয়ায় দু'একটা মেঘ উড়ে যায় উত্তরের আকাশে। রুপোলি আকাশটা কালো আঁধারের ভয়াল

রূপ নেয়। মেঘ সরে গেলে পরক্ষনে সে আবার জেগে ওঠে ধিরে। আর দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেতে কানায় কানায় ভরে থাকা কালো জলে শ্যাওলা, শাপলার গন্ধে আমেজ আনে। দূরে দুলিপাড়ায় ঢাকের তালিমের দ্রিমিম্ দ্রিমিম্ শব্দ এক ধানের ক্ষেত থেকে আন্য ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে যায় ধীর লয়ে... পূজার আয়োজনের প্রস্তুতি! মনটা আনন্দে ভরে যায়।

এক আকাশ সোনালী রোদ মেখে সাদা পেঁজা তুলো মেঘগুলো এক আকাশ থেকে আন্য আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। তাদের ছায়াগুলো সবুজ ঢেউ খেলানো ধানের ক্ষেতে খেলা করে এলোমেলো। ঝিলের জলে লাল শালুকে লাগে দুলুনি আর কালচে সবুজ পাতাগুলো হাওয়ায় উল্টে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করে আবার ভেসে থাকে কালো জলে। যেন ওদের খেলায় পেয়েছে এখন।

বন্ধুরা একে একে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝিলের জলে। তবে আর দেরি কেন এক লাফে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়া। তারপর সাঁতারে শালুক ফুলগুলো তুলে, এক ডুবে জলের নিচে পাঁক কাদার মধ্যে থেকে শালুকের মুল টেনে তুলে এনে পাড়ে জড়ো করা। ভেজা গায়ে শালুক ফুলের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে মনে পড়ে ইস্কুলে যেতে হবে! সবাই এক সঙ্গে দৌড় দৌড়।

ততদিনে খেয়াঘাটে নতুন নতুন নৌকা ভিড়তে শুরু করেছে। হরেক রকমের জিনিষপত্র বোঝাই। মনিহারি, হাঁড়ি-কলসি, লোহা-লক্কড়, জামা-কাপড় আরো কত কি যে! একে একে মালপত্র নামানো হচ্ছে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাজারের মধ্যে। বিকেলের সোনালী রোদে সে যেন এক স্বপ্নের মায়াময় পরিবেশ। এবার দৌড়ে ফিরতে হবে বাজারের দূর্গা মন্ডপে।চারদিকে সব সেজেগুজে তৈরী হচ্ছে, নতুন নতুন দোকান, রকমারী তাদের বাহার। ঝাঁ চকচকে সাজসজ্জা। চোখ ফেরানো দায়। মন্ডপের দিকে এগোতে গিয়ে দেখা যায় ডানদিকটায় একটা মস্ত বড় নাগরদোলা জমিয়ে বসেছে। ঘুর পাক খাইয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তাকে ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা সার্কাসের দল তাঁবু পেতেছে! সামনের টিনের দেওয়ালের মাঝেমধ্যে ফাঁক ফোকর দিয়ে যেটুকু ভেতরের জগৎ দেখা যায়, তাই দেখতে অনেকের ভিড়।

পালিশ না করা লাল ইঁটের উঁচু মন্ডপ সাদা চুনের প্রলেপ দিয়ে বাইরের আস্তরনে নিজের আব্রুটুকু রক্ষা করছে। মন্ডপের মধ্যে পটিদার ঘনশ্যাম পাল দূর্গার মুর্তিতে নির্বিকারে হলদে-সাদা রং-এর প্রলেপ দিয়ে চলেছে। অবাক নয়নে চেয়ে থাকে উৎসুক ভিড়, কেমন করে যেন মাটির মুর্ত্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠছে। বিশাল আকৃতির দূর্গার চালা মাটিতে ফেলে রাখা আছে। আঁকা আছে পৌরানিক কাহিনীর পটচিত্র। রয়েছে হর-পার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তি, রামের অকাল বোধন, হনুমানের পর্ব্বত হাতে উড্ডিয়মান দৃশ্য, রাম সীতা লক্ষণের বনবাস গমন, আরো আরো অনেক কিছু! যেন পৌরানিক কাহিনীর চলমান চিত্রমালা।

মন্ডপের সামনে বিশাল চারদিক খোলা যাত্রার মঞ্চ তৈরী হচ্ছে। তার লাগোয়া বড় বড় খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। কলকাতার নামী যাত্রাদল আসছে। দু'দিন হবে দুটো যাত্রাভিনয়--আষ্টমী ও নবমী।

বিজয়ায় হবে আতসবাজীর রঙ্গীন ফুলকির খেলা। হরেক রকমের বাজীর রকমারী কসরৎ আকাশ মাটি রাঙ্গিয়ে মন মাতিয়ে ব্যান্ড পার্টির বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে খেয়াঘটে হবে বিসর্জন। খেয়াঘাটে তখন মেলার চেহারা। এবার বাড়ি ফেরার পালা। জমানো এক টাকাটা দিয়ে একটা বাঁশি কিনে বাজাতে বাজাতে ফেরা। খুব-খুব ইচ্ছে করে যদি একটা বড় বাঁশের বাঁশি কিনতে পারা যেতো। দারুন লাগে বাজাতে। ওই যাত্রাদলের লোকগুলো কেমন বাজিয়ে মাৎ করে সে রকম বাজাতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে চলে যেতে যাত্রাদলে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মাটির ভান্ডারটা ঝাঁকিয়ে দেখা মেলে কয়েকটা পয়সা জমেছে। গোবিন্দ হালদারদের

বাড়ির খড়ের আঁটি খেয়াঘাটে বজরায় বয়ে দিয়ে পয়সা যা জমেছে, এই দিয়ে যদি না হয় তবে মায়ের কাছে চাইতে হবে কিন্তু মা দেবে তো! পেছন ফিরতেই দেখা গেল মা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিছু বলার আগে বলে -- "কলকাতা যাবি --ঝন্টা?" অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। হঠাৎ মা কেন কলকাতা যাওয়ার কথা বলছে! মা আবার শুরু করে --"ওখানে আনন্দে থাকবি,দুবেলা পেটপুরে খেতে পাবি। বছরে দুবার পরনের জামা কাপড় পাবি। মজার শহর কলকাতা, ঘুরে ফিরে কতকিছু দেখতে পাবি -- জানতে পারবি, অবাক বনে যাবি।"

হঠাৎ একটা খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাজারের কোলাহল, চেঁচামেচি, কলতলায় থালা বাসন ধোবার ঘ্যাড়ং ঘ্যাড়ং শব্দ, মাছের বাজারে হাঁকা হাঁকি, সব্জি বাজারে দরাদরি, রাস্তায় ভিড়ে আটকে থাকা অটোরিক্সা, ট্রাকের ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ, রিক্সাভ্যানের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ, তক্ষুনি ভরপেটা বাদুড়ঝোলা ট্রেনটা বিকট শব্দ করে তীব্র গতীতে শহরের ভেতরে ঢুকে গেল। চেয়ে দেখি হরনাথ গায়ে গামছা দিয়ে মুখে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে খেঁকিয়ে মাৎ করছে --"হুই-নবাবপুত্তুর ওঠ। বেলা চড়ে গেল, এখনো বাবু বিছানা ছেড়ে উঠা হল না। ওরা কখন উঠে কলতলায় খেটে মরছে আর উনি কোথাকার লাটসাহেবর নাতি এলেন ঘুম দিচ্ছেন? ওঠ - ওঠ হতচ্ছাড়া!"

নিধু সর্দার
ভুবনগ্রাম

পাপাঙ্গুল আর অনিফিশ -পর্ব ২

পাপাঙ্গুলের সাথে গল্প করতে করতে ফুরফুরে হাওয়ায় কখন যে অনিফিশ ঘুমিয়ে পড়েছিল তার নিজেরও মনে নেই। সকাল বেলার প্রথম মিষ্টি আলো যখন এসে পরল তার মুখে, সে তার ছোট্ট পাখনা দুটো নেড়ে একটা খুব বড় আড়মোরা ভেঙ্গে তাকালো চারিদিকে। বাঃ! কি সুন্দর, শান্ত নীল জল। তার মাঝখানে একটু দুরেই একটা ছোট্ট সবুজ দ্বিপ। আর যেখানে সবুজ দ্বিপের সাথে নীল সমুদ্রের জল মিশেছে সেখানে খুব সুন্দর একটা সাদা ফেনার রেখা। জলের উপরটাও যে এত সুন্দর অনিফিশ তা আগে জানতই না। সূর্যের সোনালি আলো জলের মধ্যে পরে খুব সুন্দর খেলা করছে। অনিফিশের সব মনখারাপ যেন এক নিমেষে কোথায় পালিয়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল পাপাঙ্গুলের মুখটাও কেমন হাসি-হাসি।

"গুড মর্নিং পাপাঙ্গুল।"

পাপাঙ্গুল বলল "ওই দেখ আমাদের সবুজ পাহাড়, আমার দেশ। এখুনি আমরা পৌঁছে যাব ওখানে। আজ অনেক বছর পরে, ফিরছি আবার ঘরে।"

অনিফিশ তার চোখদুটো বড়বড় করে বলল – "সত্যি?"

পাপাঙ্গুলের ছাকনি শেষে এসে পৌঁছল পশ্চিম সাগরের তিরে, সবুজ পাহাড়ের গায়ে। এক লাফে পাপাঙ্গুল নেমে পরল জলের কাছে, তারপর, তার সেই ছাকনি-নাওটাকে তিরের কাছে এনে শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে একটা গাছের সাথে। পাপাঙ্গুলের মনের মধ্যে একরাশ আনন্দ। ঘরে ফেরার সুখ যেন লেগে আছে তার চোখে-মুখে। রাত জাগার ক্লান্তিতে সে এতটুকুও দমেনি। এমন রাত তো সে আগে কতই জেগেছে। তবে তার কালকের রাত জাগা যেন সেসব রাতের থেকে আলাদা। কাল সে একটা নতুন বন্ধু পেয়েছে। আর তার সাথে সে অনেক বছর পরে অনেক কথা বলেছে – প্রানের কথা, মনের কথা, সুখদুঃখের কথা যা এতকাল ধরে জমে ছিল তার মনে। হটাৎ পাপাঙ্গুলের মনে পরল, কই অনিফিশের

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ছাকনির মধ্যে উঁকি মেরে দেখল ছাকনি ফাঁকা! "অনিফিশ...!!" সে ছাকনির মধ্যে নেই। হটাৎ ধক করে উঠল পাপাঙ্গুলের বুক। অনিফিশ কি তাকে না বলেই চলে গেল নাকি? কিন্তু কেন? ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাল পাপাঙ্গুল। কোথাও নেই অনিফিশ, কোথায় গেল সে? পাপাঙ্গুল যখন নিজের মনে ঘরে ফেরার অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছিল নিজেরই সাথে, সে সময় কি অনিফিশ ছাকনি থেকে অন্য কোথাও চলে গেছে সমুদ্রে? একটু সময় পাপাঙ্গুল যতটুকু দেখেছে তাতে সে বেশ ভালোই বুঝেছে অনিফিশ ভীষণ মুডি আর অভিমানী একটা গোল্ড ফিশ। তার মুডটা ভীষণ সাঁতরে বেড়ায় তারই মত। সে কি হটাৎ করে...?

এসব ভাবছে পাপাঙ্গুল এমন সময় দেখে তার পিঠে কি যেন একটা সুরসুর করছে। হাত বারিয়ে দেখে

– ওমা! এ কে? এতো তার ছোট্ট অনিফিশ। পাপাঙ্গুল হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে বলল –

"কোথায় গেছিলে তুমি ছাকনি ছেড়ে?"

"এই নীল জল দেখে আর লোভ সামলাতে পারছিলাম না, টুপ করে একটা ছোট্ট সাঁতার কেটে নিলাম।" – হাসি হাসি মুখ করে বলল অনিফিশ। অনিফিশ তো আবার জল দেখলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। হাজার হোক, সে তো গোল্ডফিশ, সাঁতার কাটাই তার সখ।

পাপাঙ্গুল আর অনিফিশ তারপর একসাথে চলতে শুরু করল সেই সবুজ পথ ধরে। সেই আগের মতই আছে পাপাঙ্গুলের দেশ। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একেকটা জায়গা আসে, আর পাপাঙ্গুল অনিফিশকে দেখিয়ে বলে এক এক মোড়ের, এক এক বাঁকের গল্প। অনিফিশ তো জলের লোক, সে কখন ডাঙার গল্প শোনেইনি। তাই সে সেসব গল্প শুনে ভারী মজা পায়। অনিফিশ তার ছোট্ট মাথাটা নাড়িয়ে পাখনা নেড়ে অনেক প্রশ্ন করে – "পাপাঙ্গুল এটা কি গাছ? ওটা কি? এটাকে কি বলে?"

হটাৎ একটা জায়গায় এসে পাপাঙ্গুল থমকে দাঁড়াল। পাপাঙ্গুলের সেই হাসি-হাসি মুখটায় একনিমেষে আঁধার নেমে এল। অনিফিশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল – "কি হয়েছে পাপাঙ্গুল?"

"এখানেই এখানেই ছিল আমাদের ঘর। সেই ঝরের রাত্রে ঘর ভেঙ্গে গেছে, আর কেউ কোথাও নেই।"

পাপাঙ্গুলের চোখদুটো জলে ভরে উঠল। অনিফিশ পাপাঙ্গুলের হাতের উপর হাত রাখল, মুখে কিছু বলল না। কিছুক্ষন সেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকল তারা দুজনে।

এমন সময় হটাৎ চারিদিকে কিছু লোকজনের গলার আওয়াজ পেয়ে পাপাঙ্গুল আর অনিফিশের ঘোর ভাঙল। দেখে তাদের দুজনকে ঘিরে বেশ কিছু সবুজ চুলের লোকজন জড়ো হয়েছে। যাদের দেখলেই বোঝা যায় এরা পাপাঙ্গুলের মতই আরও সব লোক এই দেশেরই। অনিফিশ একটু থতমত খেয়ে গেল। আসলে এমন ধরনের প্রানি তো আগে কখনও দেখেনি, সে তো জলের মাঝেই থেকেছে চিরটাকাল। তার তো শুধু সমুদ্রের ওই মাছগুলোই বন্ধু ছিল। দুয়েকটা অন্য বন্ধু ছিল বটে, তবে কি, অনিফিশকে তার মা ভীষণ শাসন করে রাখতেন। তাদের সাথে তেমন বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না। একসাথে এদের দেখে সে কিছুটা গুটিয়ে গেল। একটু ভয়ে সে পাপাঙ্গুলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বুড়ো দাদু এসে পাপাঙ্গুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে বলল – "পাপাঙ্গুল পাপাঙ্গুল!"

পাপাঙ্গুলের মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল – "ছটপটি দাদু, আমি তোমাদের পাপাঙ্গুল।"

চারিদিক থেকে আনন্দের উল্লাসের ঢেউ বইতে শুরু করল। "পাপাঙ্গুল, পাপাঙ্গুল।" তারা হাত-পা নেড়ে নানা ভাবে জানিয়ে দিল তাদের ভালোবাসা। এতো ভালোবাসা উচ্ছ্বাস দেখে পাপাঙ্গুলের দুচোখ আনন্দের কান্নায় ভিজে গেল। অনিফিশও তাই দেখে বেজায় খুশী হল। পাপাঙ্গুল তাদের দিকে ফিরে বলল - "এই আমার বন্ধু অনিফিশ। আজ থেকে এ আমাদের অতিথি হল।" অনিফিশ তাই শুনে খুব লজ্জা পেয়ে আরও একটু পাপাঙ্গুলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কিছু ছোট্ট ছোট্ট বাচ্ছা "নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল", তারা সব্বাই মিলে অনিফিশের কাছে এসে তার পাখনায়-গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে দিল। অনিফিশ বেজায় খুশী হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। সবাই মিলে অনিফিশকে দেখে গেয়ে উঠল -

"আহা আলঙ্গুশ, আজ আমাদের মেজাজ বড় খুশ, আহা আলঙ্গুশ"

এই বলে সবাই মিলে পাপাঙ্গুল আর অনিফিশকে নিয়ে চলে গেল, সেই সবুজ দেশে, সবুজ গাঁয়ের মাঝে...

লেখা ও ছবিঃ
অনন্যা দত্ত
কলকাতা

ভূতোর ভূত

নাম ছিল তার ভূতো।নামে যাই মনে হোক না কেন-- আসলে ভূতো ছিল বেশ বুদ্ধিমান।
সে দিন আমি ও খোকন দা রাস্তায় পায়চারী করছিলাম--এমনি সময় ভুতো এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো।কথায় কথায় আমি আমার ভূত দেখার কথা বললাম ওকে।ও ইন্টারেস্ট নিয়ে বলল,'কোথায় দেখেছিস?'

বললাম,'ওই তো শ্যামরাই পাড়ার পোড়ো বাড়িটায়'।খোকন দা মাঝখানে বলে উঠলো,'কে জানে ভূত দেখেছে কি না!ও নাকি ছাগল ভূত দেখেছে ওখানে!'

--'ছাগল ভূত!'ব্যঙ্গ করার মত টেনে টেনে বলে উঠলো ভূতো,'মানুষ ভূত হলে হতেও পারে--কিন্তু জীবনে এই তোর মুখেই প্রথম শুনলাম ছাগল ভূত!'খোকনদাও ভূতোর দলে যোগ দিলো--ভূতোও সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগলো।

আমার রাগ হল,ওদের দু জনের ওপর রাগ করে চুপ চাপ বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

--'এই দেখো,রেগে গেলি কেন?'খোকনদা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বলে উঠলো—'তুই দু দিনের জন্যে আমাদের বাড়ি এসেছিস,এসব রাগ গোঁসা নিজেদের মধ্যে মানায়?'

ভুতো কাছে এসে খোকনদাকে বলল,'ও তোমাদের বাড়ি এসেছে নাকি?'

--'হ্যাঁ,আমার মাসির ছেলে,রানাঘাট থেকে এসেছে।'ভুতো আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,'তাহলে ওই বাসে এসেছিস বোধ হয়--রানাঘাট টু কালনা ঘাট?'

--'হ্যাঁ',সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।
ভূতো বলল,'আমিও মামা বাড়ি যাই ওই বাসে--শান্তিপুরে আমার মামার বাড়ি'।

সামান্য সময় তিনজনেই চুপ চাপ হাঁটছিলাম।মাঝখানে ভূতোই বলে উঠলো,'তবে হ্যাঁ,ওই পোড়ো বাড়িতে

ভূত আছে ঠিকই!'ভূতো খোকনদার দিকে তাকিয়ে বলল,'তুমি তো জানো দাদা,আমাদের বাড়ি কোথায়?'

--'হ্যাঁ,হ্যাঁ,মানে ওই পোড়ো বাড়ির আশপাশে কোথাও—তাই তো?'খোকনদা বলে ওঠে।

--'হ্যাঁ,মানে ওই ভাঙ্গাচোরা পোড়ো বাড়ির একটা বাড়ি আগে--ওই বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে',ভূতো কথাগুলি বলে একটু থামল,তারপর আবার শুরু করল,'দেখো আমি ভূত বিশ্বাস করিনা--তবু তোমার ভাই--নাম যেন কি?'

--'তপন',খোকন দা বলে উঠলো।

--'হ্যাঁ, তপন যখন বলেছে তখন তো ভূত ওকে দেখাতেই হবে',এবার যেন ভূতোর ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলিক খেলে গেলো।

আমি এবার কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম,'সত্যি ভূত আছে?'

--'তা জানি না,তবে তোমাদের আমি দেখাবো',কেমন যেন হেঁয়ালির মত কথাগুলি বলে ওঠে ভূতো!

--'দেখা তবে,কবে দেখাবি বল?'যেন আমার মুখের প্রশ্নটাই খোকনদা ভূতোকে বলে উঠলো।

ভূতো বললো,'অমাবস্যা রাতেই দেখা যায়।সে দিন রাত ঘন কালো থাকে।ভূতেরা নিজেদের ছায়া বানিয়ে চলাফেরা করতে পারে।আর বেশী আলোতে ওদের দেখা যায় না--কারণ তখন ভূতেরা আলোর সঙ্গে মিশে থাকে,'কথা কটি বলে ভূতো আমার দিকে তাকিয়ে কেন যেন মুখ টিপে হাসল!
খোকন দা বলল,'বাবা:,ভূতের সম্বন্ধে তুই তো অনেক কিছু জানিস?'

--'হ্যাঁ,ওসব জানতে হয়',বিজ্ঞের মত ভূতো জবাব দিলো। বাড়ি গিয়ে খোকনদা দেখলাম পঞ্জিকাতে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে!আমি ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না,সোজা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,'মা,অমাবস্যা কবে গো?'

মা আশ্চর্য হলেন,'বললেন,তুই অমাবস্যার খোঁজ করছিস!ব্যাপার কি বলত?'

--'এই,এমনি',বলে সব কথা চেপে গেলাম। মা বললেন,'আগামী শনিবার অমাবস্যা থাকবে।'

খোঁজ নিয়ে খোকন দার কাছে পৌঁছে গেলাম।দেখি খোকনদা তখনও পঞ্জিকা ঘেঁটে চলেছে!
নিজেকে বুদ্ধিমান জাহির করার মত ভাব নিয়ে বলে উঠলাম,'এই শনিবার অমাবস্যা।'
সঙ্গে সঙ্গে খোকনদা বলে উঠলো,'তুই কি করে জানলি?'খোকন দা আমার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে আমায় প্রশ্ন করে ওঠে।

--'হ্যাঁ,মার কাছে শুনেছি',ভণিতায় না গিয়ে বলে ফেলি। দু দিন পরেই ভূতোর সঙ্গে ওদের বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেলো।দেখলাম ভূতুড়ে বাড়িটা ওদের বাড়ির সামনের দিকে,ওদের বাড়ি থেকে তাকালে স্পষ্ট ও বাড়ি দেখা যায়!
ভয়ে ভয়ে বলে উঠলাম,'রাতে তোদের ভয় লাগে না?'

--'কিসের ভয়?' স্বাভাবিক ভাবে ভূতো বলে উঠলো।

--'এই শনি বারে অমাবস্যা রে!কখন আসলে তুই ভূত দেখাতে পারবি বল?'খোকন দা ভূতোকে কথাগুলি বলল।ও যেন কিছু একটা চিন্তা করল,তারপর বলল,'তা রাত দশটার পরে আয়!'

মনে মনে ভয় হচ্ছিল,বাবা:,রাত দশটার পরে এই ভূত বাড়ির পাশে আসতে পারব তো? খোকনদা বলল,'ঠিক আছে,আমরা তিনজন আসবো।আমরা দুজন,আর সঙ্গে বন্ধু রবিও থাকবে।আর ভূতো!তুই তো আছিসই।'

ভূতো তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,'না,না,না,আমি থাকতে পারব না,আমার ওই দিন ইমপরটেন্ট কাজ আছে।'

--'তবে?আমি বলে উঠলাম,তবে আর কি করে ভূত দেখা হবে?'

--'রাত এগারোটা বাজবে আর দেখবি ভূতেরা এসে যাবে--রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোরা দেখতে পাবি', ভূতো তার কথাগুলি বলে যায়।

--'রাস্তা থেকেই দেখা যাবে!' খোকনদার আবার প্রশ্ন।

--'হ্যাঁ,দেখবে পোড়ো বাড়ির দেওয়ালে বড় বড় ভূতের আকৃতি--নড়াচড়া করবে--ফিসফিস করে কথা বলবে,কিন্তু তোমরা কিছু শুনতে পাবে না!'

--'আচ্ছা!',হতবাক হয়ে কল্পনা করতে থাকলাম।এখনি যেন গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে যাচ্ছে! খোকনদা এবার আমার পিঠে হালকা চাপড় দিয়ে বলে উঠলো,'তপন তা হলে পোড়ো বাড়ির ছাগল ভূত সত্যি হবেরে--যেটা তুই সে দিন দেখেছিলি!'

--'তবে?তোমরা তো কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাও নি',আমি যেন নিজের বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলাম।

শনিবার সন্ধ্যে থেকেই আমরা মনে মনে রোমাঞ্চিত হতে লাগলাম।বারবার ঘড়ির দিকে নজর রাখতে লাগলাম।কথা ছিল রাতে খেয়ে দেয়ে সোজা শোয়ার ঘরে ঢুকে যাবো।আমি আর খোকনদা রাতে এক

ঘরে শুই। রাত সাড়ে দশটা হবে কি আমরা দাদা-ভাই বের হবো ভূত দেখার অভিযানে। আগে থেকে কথা ছিল যে রবি আমাদের সঙ্গে যাবে। পোড়ো বাড়িতে যাবার সময় মাঝ পথ থেকে ওকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হবে। ও ঠিক রাত সাড়ে দশটা থেকে নিজেদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে।

রাত সাড়ে দশটা বাজলো,আর দেরী করা যায় না--ধীরে ধীরে আমরা দরজা খুলে পা টিপে টিপে রাস্তায় এসে নামলাম। বাড়ির কেউ জানবার কথা নয়। আমরা জানি এসব কথা জানাজানি হলে সবাই আমাদের ভূত দর্শনে বাধার সৃষ্টি করবে। তাই আমাদের চারজন বাদে পঞ্চম ব্যক্তিকে এ কথা জানানো যাবে না।

রাস্তার লাইট পোস্টের টিমটিমে আলোগুলি জ্বলছিল। আলোগুলি অনেক চেষ্টাতেও যেন রাস্তা আলোকিত করতে পারছিল না। আকাশে চাঁদ মামার চিহ্ন নেই। আর থাকবেই বা কি করে--আজ অমাবস্যা,তার ওপর শনিবার! ভূত বিশ্বাসী লোকেরা বলে যে ভূত প্রেতদের জাগরণ নাকি এই দিনেই হয়!

নিজের ছায়া দেখেই ভয় পাচ্ছিলাম। ভয়ে খোকনদার এক হাত ধরে রাখলাম। দাদাকেও ভয়ে অনেক সংকুচিত মনে হল। রাস্তা ভালো দেখা যাচ্ছিল না। দু লাইট পোস্টের মাঝখানটায় জাগায় জাগায় অন্ধকার দানা বেঁধে রয়েছে।

--'দাঁড়া',খোকন দা বলে উঠলো,'রবি আসবে'। ডাকার প্রয়োজন হল না,রবি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর বেশী দূর না--তবে ভূতুড়ে বাড়ির সামনের লাইট পোস্টের বাল্ব জ্বলছিল না। এত অন্ধকার যে রাস্তা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। তিন জনে ভূতুড়ে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবার হাত সবাই ধরে আছি। সবার গায়ে সবার গা ঘেঁষে আছে। সামনে অন্ধকার,বাড়ি ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কেবল ভূত বাড়ির সীমারেখায় এক অনুজ্জ্বল আলো ছায়ার সরল রেখার মত ঘিরে ছিল। চিহ্নিত বাড়ির সীমানা যেন মানচিত্রের মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে আছে!
রবি ফিস ফিস,চাপা স্বরে বলে উঠলো,'লাঠি,টর্চ সঙ্গে আনতে হতো না?'

--'না,ভূতো মানা করেছে--ও সব হাতে থাকলে নাকি ওরা দেখা দেয় না', খোকনদার গলার স্বর মনে হল হাওয়ায় ভেসে আসছিল।

কয়েক মিনিট পরের কথা—হঠাৎ দেখি সাদা সাদা ছবির মত কতগুলি ছায়া এসে পড়ল ভূতুড়ে বাড়ির দেওয়ালে! আর একি! বিরাট এক কঙ্কাল নেচে উঠলো! তার মধ্যেই দেওয়াল ধরে লোকেরা ছুটে কোথায় চলে গেলো! শব্দ নেই--তবু মনে হল ভূতেরা কিছু বলে চলেছে। সাদা ছায়াগুলি প্রকাণ্ড বড় বড়--পনের বিশ হাত লম্বা লম্বা—ভূতের মত দু মিনিট ঘুরে বেড়াল।

ইতিমধ্যে আমার পা কাঁপতে শুরু করেছে--চার দিকে অন্ধকার দেখছিলাম। খোকনদাকে জড়িয়ে ধরে কিছু যেন বলতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমার ওপর অনেকগুলি মাথা ঝুঁকে আছে! ভূতোকে দেখে আমি,'ভূত',বলে চীত্কার করে উঠলাম!

--'না,না,কিচ্ছু না,ভূত বলে কিছু আছে নাকি! ভয় পেও না তুমি',বয়স্ক একজন আমায় কথাগুলি বলছিল।

--'কেমন লাগছে এখন?'খোকনদা আমায় বলে উঠলো।
নিজেকে সামলে নিলাম,বললাম,'ঠিক আছি'।

এক বয়স্কা মহিলা এক গ্লাস দুধ এনে আমার সামনে ধরে বললেন,'নাও বাবা!এটুকু খেয়ে নাও।খুব দুর্বল তুমি!'

জানতে পারলাম ভূতোদের বাড়িতে আমি।এতক্ষণ ভূতোর মা,বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।দুধ খেয়ে অনেকটা সুস্থ হলাম।খোকনদাকে বললাম,'চলো বাড়ি যাই।'

--'যেতে পারবি তো?' ভূতো তির্যক হেসে বলে উঠলো,আর 'ভূত দেখবি না?'

--'না,না', যেন অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে।

হাসল ভূতো,তারপর ওর পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে বলল,'দেখ আবার আমি ভূত দেখাচ্ছি।'ও মোবাইলের প্রজেক্টর সেট করে ভিডিওর মত চালিয়ে দিল।আর আমাদের সামনে ভূতোদের ঘরের দেওয়ালে ভেসে উঠলো সেই কঙ্কাল,সেই ভূতগুলি--যেগুলি আমরা পোড়ো বাড়ির দেওয়ালে দেখে ছিলাম।এবার প্রথমটা ভয়ে থমকে গিয়েছিলাম,সঙ্গে সঙ্গে ভূতো বলে উঠলো,'সিনেমা যেমন দেখিস আমি আমাদের ব্যালকনি থেকে তোদের এমনি করে ভূত দেখাচ্ছিলাম রে!এই মোবাইলে প্রজেক্টর সিস্টেম লাগানো আছে—প্রজেক্টর হল সিনেমা দেখানোর মেশিন।

রবি,তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো,আচ্ছা--সেই জন্যে আমি ওই সময় তোদের ব্যালকনি থেকে টর্চের মত কিছু জ্বলে থাকতে দেখে ছিলাম!
ভূতোর ভূতের রহস্য উদ্ঘাটিত হল।আমরা চুপি চুপি ঘরে ফিরে ঘুমের কোলে ঢলে গেলাম।

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্যপ্রদেশ

মেডেল নিলেন না নন্দপিসি

দেবীপুরের নন্দপিসি এক স্যাম্পেল। দেবীপুর জায়গাটাকে এই একবিংশ শতাব্দীতেও মোটামুটি গণ্ডগ্রামই বলা চলে। তবে ইদানীং সেখানেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এখানে-সেখানে পাকা বাড়ি। কাঁচা রাস্তার মাঝে মাঝে কিছু বাঁধানো সড়ক – সাইকেল, রিকশা ও ভ্যান রিকশার পাশাপাশি তাই এসে গেছে বাস, অটো, এমনকি দু-চারখান চারচাকা। বিজলি এসেছে, তবে অল্প কিছু ঘরেই। যেখানে নেই, সেখানেও অবশ্য পালে-পার্বণে সিনেমা-টিনেমা দেখার জন্য আসে ভাড়া করা জেনারেটার।
এসবের মধ্যে নন্দপিসি অর্থাৎ নন্দরাণী চৌধুরানি যেন একশো বছর আগেকার বাংলার থেকে কেটে বসানো এক জগদম্বা বা ক্ষেমঙ্করী। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান সবারই তিনি 'পিসি'। তাঁর দাদাশ্বশুর ডাকসাইটে জমিদার দেবীপ্রসন্ন চৌধুরির নামেই নাকি এ গাঁয়ের নাম। শ্বশুর মুকুন্দনারায়ণও ছিলেন খুব দাপুটে। মুকুন্দের দুই ছেলে উমাশঙ্কর ও কিরণশঙ্কর লেখাপড়া শিখে চাকরির জন্য কলকাতা পারি দেন। কিরণ বাপের অমতেও শেষ অবধি সেখানে পরিবার নিয়ে যান। কিন্তু বড়ছেলে উমার স্ত্রী নন্দ শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে নড়তে রাজি হন না, ফলে উমারও শনি-রবি ও ছুটিছাটায় গ্রাম-শহর যাতায়াত থেকে রেহাই মেলে না। সঙ্গীহীন মুকুন্দ পুত্রবধূ নন্দকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। ছেলেদের আশা ছেড়ে নন্দকেই তিনি জমিদারি দেখাশোনা ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাজ শিখিয়েছিলেন। লোকে বলে সেই জন্যেই নাকি পিসির চলনে-বলনে খানিকটা পুরুষালি ভাব।

সে অবশ্য শোনা কথা। তারপর ইচ্ছামতী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পিসির শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামী গত হয়েছেন। ছেলে-মেয়েরাও শহরে প্রতিষ্ঠিত। তাদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পিসি এখনো একা এই দেবীপুরেই পড়ে আছেন, শ্বশুরের ভিটে আগলে। এবং এভাবেই শেষ দিন অবধি থাকবেন বলে ঘোষণাও করেছেন। ছেলেমেয়েরা অগত্যা মাঝেমাঝে মা'কে দেখে যায়, কৌশলে কিছু সাহায্য করারও চেষ্টা করে। কৌশলেই, কারণ জমিদারি কবে চলে গেলেও পিসির মটমটে আত্মসম্মান। নাতি-নাতনির হাত দিয়ে কিছু পাঠালে অবশ্য তিনি প্রাণে ধরে ফেরাতে পারেন না আর এই চালাকিটা

ছেলেমেয়েরা শিখে নিয়েছে।

অবশ্য তেমন কিছু দরকারও হয় না। জমিদারি গিয়েও বাড়ির লাগোয়া কিছু বাগান, খেত, ফলের গাছ আছে – সেসবে যা ফলে তাতে পিসির অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার রসদ অনায়াসে জুটে যায়। বাড়িতে বসে গাছের ফলপাকড় পাহারা দেওয়া এখন পিসির অন্যতম কাজ। এ ব্যাপারে তিনি দারোগার মতোই কড়া। মাঝে মাঝে ঘরে বসে হাঁক পাড়েন, "অ্যাই, কে রে? পালা বলছি, নইলে দাঁড়া বন্দুক বের করছি –"

ফল সংগ্রহে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা কখনো ভয় পায়, কখনো খিলখিলিয়ে হাসে, "বাপ রে, ভয়েই ম'লুম – পিসি বন্দুক চালাবে!" পিসির ঘরে অবিশ্যি সত্যিই তাঁর শ্বশুরের আমলের একটা দোনলা বন্দুক টাঙানো। সেটা মাঝেমধ্যে সাফসুতরোও হয়। তবে পিসির যতই পাহারাওয়ালা-সুলভ জাঁদরেল চেহারা ও ব্যক্তিত্ব থাকুক না কেন সে বন্দুক চালাচ্ছে ভাবলেই –

হাঁকে কাজ না হলে পিসি অগত্যা "কোন লক্ষ্মীছাড়ার দল রে!" বলতে বলতে আসরে নামেন। এবার কাজ হয় – বালখিল্যের দল ছুট লাগায়। কিছু দুঃসাহসী অবশ্য অত সহজে পিটটান দিতে রাজি হয় না। তখন শুরু হয় সম্মুখসমর এবং বলা বাহুল্য, পিসিই শেষ হাসি হাসেন। একবার নাকি তিনি কাকে গাছে উঠে ঠ্যাং ধ'রে টেনে নামিয়েছিলেন।

কিন্তু নিক না দু'টো ফল? তুমি নিজে আর ক'টা খাও, শেষ অব্দি তো সেই বিলিয়েই দাও? না, সে চলবে না। চেয়ে নাও, ঠিক আছে। কিন্তু চুরি – অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে? লোকে অবিশ্যি বলে, তা নয়। আসলে কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে পিসির আঁতে ঘা লাগে।

তা, ছেলেমেয়েদেরও কি প্রেস্টিজ নেই? কোন মুখে গিয়ে তারা পিসির কাছে হাত পেতে দাঁড়াবে? আর চুরি করা ফলের স্বাদ কি কখনো চেয়ে নেওয়া জিনিসে পাওয়া যায়? সুতরাং ঠাণ্ডা লড়াই চলতেই থাকে। তবু এই বালখিল্যদের নিয়েই পিসির জীবন। পালে-পার্বণে তাদের পিঠে-পুলি, নাড়ু-মোওয়া না খাওয়ানো অবধি তাঁর শান্তি হয় না।

পারতপক্ষে পিসি বাড়ি ছেড়ে নড়েন না। মাঝে মাঝে কয়েক কিলোমিটার দূরে ব্যাঙ্কে যান, তখন রিকশা বা ভ্যান রিকশা নেন। কিন্তু অটোরিক্সা, বাস কদাপি নয়। কলের গাড়িকে তাঁর ঘোর অবিশ্বাস – তারা যে কখন মানুষের ঘাড়ে চাপবে বা যাত্রীকে উলটে দেবে, তার নাকি কোনো ঠিক নেই। একদিন মধুর ভ্যান রিকশায় উঠে দেখেন সেখানে মোটর লাগানো। "চল তোকে পুলিশে দিই" বলে তার ঘাড় এমন জোরে ধরেছিলেন যে সে বেচারা মাপ-টাপ চেয়ে দু'দিনের মধ্যেই আবার ওসব খুলে ফেলবে বলে নাকে খৎ দিয়ে তবে রেহাই পায়।

হাসপাতাল-ডাক্তারখানা? ওসব পিসির লাগে বলে কেউ শোনেনি। বয়েস সত্তর না আশির কোঠায় কে জানে – কিন্তু তাঁর দাঁত একটাও পড়েনি, চুল দু-একগাছার বেশি পাকেনি। চশমা ছাড়াই ব্যাঙ্ক ও বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত সব দরকারি কাগজপত্তর নিজেই দেখাশোনা করতে পারেন।

তা, বিষয়-সম্পত্তি যখন আছে, থানা-পুলিশ নেই? না, তেমন দরকারও ওখানে বড় একটা হয় না। গ্রামের লোকেরা সাদা-সরল। মাথা গরমে কিছু ঝগড়া-বিবাদ হলে সে তারা মাথা ঠাণ্ডা হলে আবার নিজেরাই সালিশি করে নেয়। আর লোকের পেটে ভাত থাকলেও সোনা-দানা বড় একটা নেই। তাই চোর-ডাকাত পণ্ডশ্রম বুঝে সেদিক ঘেঁষে না।

অন্ততঃ ঘেঁষতো না। কিন্তু তারপর একদিন মুখুজ্জেরা গ্রামে এলেন।

মুখুজ্জেরা মুম্বই না বেঙ্গালুরু কোথায় যেন থাকেন। সেখানে তাঁদের চাকরি, ব্যবসা – সব মিলিয়ে দারুণ রবরবা। দেবীপুরে নন্দপিসিদের ভিটের পাশে তাদের পৈতৃক ভিটে খালিই পড়ে থাকে। হঠাৎ এক ছেলের খেয়াল হলো – গরমে বাচ্চাদের স্কুল-কলেজে যখন লম্বা ছুটি, তখন এখানে এসে তারা মাসখানেক সপরিবারে থেকে যাবে। বেশ অন্যরকমের একটা অভিজ্ঞতা হবে। আর – মেজ ছেলে ফিল্ম লাইনের সাথে যুক্ত – তার মাথায় আছে, জায়গাটা যদি পছন্দ হয় তো বাড়িটাকে সিনেমার শ্যুটিংয়ের কাজেও লাগানো যেতে পারে।

সুতরাং দেবীপুর সরগরম। বাড়িঘর রঙ হলো, ঝোপ-জঙ্গল সাফ-সুতরো। বিজলির জন্য বসলো পেল্লায় এক জেনারেটার। তারপর নির্ধারিত দিনে ল্যাণ্ডাবাচ্চাদের হাঁ-করা চোখের সামনে পেটভর্তি মাল নিয়ে ঢুকলো একটা লরি আর তার পেছন পেছন একটা ঝাঁ-চকচক চারচাকা। লরিকে অবশ্য ভেতর পর্যন্ত আনা গেলো না। সুতরাং অনেক হুলুস্থুলু করেই শেষ অব্দি মুখুজ্জে পরিবার তাঁদের আদিভূমিতে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের মেয়েদের গা ভরা গয়না, পুরুষদেরও হাতে আংটি, গলায় চেন। আর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নব্য বারমুদা-স্ল্যাকস শোভিত। তাদের হাতে হাতে মোবাইল।

তাদের দিকে, বিশেষ করে 'কলের গাড়ি'টার দিকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিসি বিড়বিড় করেন, "ঘোর অনাছিষ্টি, ঘোর অনাছিষ্টি! এবার একটা বিপুয্যয় না হয়ে যায় না!" কে তাকে বোঝাবে, এসব আধুনিকতা শহরে কেন, গাঁয়ে-গঞ্জেও আজকাল জলভাত।

খোলা মাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস আর অবারিত আলো দেখে ছোটদের তো খুশি ধরে না। বেশ কিছুক্ষণ পাড়ায় এলোমেলো ছুটোছুটি করে বেড়ালো। কয়েকজন সাহস করে পিসির দোরেও উঁকি মারলো। পিসির 'মুড' এতক্ষণে কিছুটা ঠিক হলো। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, কাছে এলে হাতে নাড়ু-পাটালি তুলে দিলেন। "নাইস হোম-মেড চকলেট!" মুখে দিয়ে কলকল করতে করতে বাচ্চারা আবার চরায় বেরোলো।

তাদের আনন্দ অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই মিইয়ে গেলো, যখন দেখলো যে মোবাইলে টাওয়ার লাগছে না। অনেক খোঁজ-ভিজের পর পাড়ার গজু বললো, "বাছারা, এই অজ পাড়াগাঁয় ওসব পেরাইভেট-সম্রাট (স্মার্ট?) ফোন কাজে লাগবেনি। তাচ্চেয়ে ঐ চাকাগাড়িতে করে চাকুলি বাজারে গিয়ে পানুদার দোকান থেকে সস্তার চিনা মাল কিনে তাতে সরকারি (বি-এস-এন-এল?) কাড ভরো।" কিছু দ্বিধার পর মুখুজ্জে বাপরা তাই করলেন আর ফলে অন্ততঃ 'কভি-হাঁ-কভি-না' গোছের সিগন্যাল জুটতে লাগলো। এরপর ভালোয়-মন্দে তাদের দিন কাটতে লাগলো। প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে গাঁয়ের লোকেদেরও মুখুজ্জেদের উপস্থিতিটা গা-সওয়া হয়ে গেলো। কিন্তু আরো কেউ ব্যাপারটা লক্ষ করছিলো।

নিশুতি রাত। পাড়া অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনকি নিশাচর মুখুজ্জেরাও মোটামুটি বিছানায়। এমন সময় তাদের দরজায় প্রবল ধাক্কা, সাথে বাজখাঁই গলার আওয়াজ, "এ্যাই, ভালোয় ভালোয় দরজা খুলে দে, নইলে –"

প্রাথমিক ভ্যাবাচাকা ভাব কেটে গেলে পর বোঝা গেলো – বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তারপর হৈ-চৈ, কান্নাকাটি, প্রবল বিশৃঙ্খলা। সোরগোলে আশেপাশের বাড়িঘরেও আলো জ্বলে উঠলো, কিন্তু ব্যাপার মালুম হবার সাথে সাথে সেসব টুপ করে নিভিয়ে যে যার ঘরের দোর এঁটে কাঁপতে লাগলো।

ঘুম ভেঙেছে পিসিরও। কী হয়েছে বুঝতে তাঁর অবশ্য দেরি হয়নি। এককালে জমিদার বাড়ির বৌ ছিলেন, এসব ঘটনা তিনি অনেক দেখেছেন। ভাবনা-চিন্তার পর গোছগাছ করতে অবশ্য একটু সময় লাগলো, কিন্তু তারপর তিনি নির্দ্বিধায় বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ডাকাতরা ততক্ষণে চরমপত্র দিয়েছে – ভালোয় ভালোয় দরজা খুলে না দিলে তারা ভেঙে ঢুকে সবাইকে কচুকাটা করবে, নয়তো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। এমন সময় পিসি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা তুলে চেঁচিয়ে বললেন, "কী ভেবেছিস হতচ্ছাড়ারা – নন্দ বামনি বেঁচে থাকতে পাড়ায় অনাচার করবি? সময় থাকতে পালা, নইলে দেখেছিস –"

ডাকাতরা ঘুরে দাঁড়ালো। মশালের আলোয় চোখে পড়লো – তাদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে পিসি। ডাকাত সর্দার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, "তুমি বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো ঠাকরুণ – তোমার সাথে আমাদের কোনো কাজিয়া নেই। তবে বন্দুক-টন্দুক খুব খতরনাক চিজ, ওসব নিয়ে আনাড়িদের খেলা কত্তি নেই।" তারপরই তারা আবার মুখুজ্জেদের সদরে লাগালো বেপরোয়া লাথি। দুম! – পিসির বন্দুক গর্জে উঠেছে আর সাথে সাথে ডাকাত সর্দার আর্তনাদ করে বসে পড়েছে – তার ডান হাঁটুটা গেছে! "আনাড়ির মার!" – কাতরাতে কাতরাতে বলতে যাচ্ছে, এমন সময় গর্জে উঠলো পিসির বন্দুকের দ্বিতীয় নল আর এবার ডাকাতের অ্যাসিস্ট্যান্ট কুপোকাৎ। এই আচমকা বিপর্যয়ে ডাকাত দল মুহূর্তে বিশৃঙ্খল আর পিসি সেই সুযোগে অভিজ্ঞ হাতে বন্দুক আবার 'লোড' করে নিয়েছেন। আর এক রাউণ্ড গুলি ছোটার পর ডাকাতদের সাহস উধাও – গণ্ডগ্রামে এসে ফাঁকা ময়দানে গোল দেবে ভেবেছিলো, বন্দুকের সাথে লড়তে হবে ভেবে তৈরি হয়ে আসেনি। আহত সাথীদের ছেড়েই এবার বাকিরা পিটটান দেবার রাস্তা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধে হলো না।
জেলার ডেপুটি এস-পি মালবিকা দাস যেন কোন মুখুজ্জে বৌয়ের ক্লাস ফ্রেণ্ড। তার নম্বরটা জানা ছিলো, কপাল ভালো এই সঙ্কটের মুহূর্তে লাইনটাও লেগে গেলো। পুলিশ সাধারণতঃ রামধনুর মতো – ঝড়বৃষ্টির পর উদয় হয়। কিন্তু 'বিগ বস' মালবিকার তাড়ায় অন্যথায় জগদ্দল স্থানীয় থানা মুহূর্তে তটস্থ হয়ে উঠলো আর ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ও-সি সদলবলে অকুস্থলে হাজির হলেন। গোটা তিনেক জখম ডাকাত ছাড়াও আরো ক'টা ধরা পড়লো। দু-চারটে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালালো বটে, কিন্তু সঙ্গীদের জেরায় নাম ফাঁস হয়ে যাবার পর এখন তারাও ধরা পড়ার অপেক্ষায়।

পরদিন থেকে দেবীপুর লোকে লোকারণ্য – ফিলিম-তোলা ভ্যান গাড়ি, খোঁচাদাড়ি ক্যামেরাম্যান আর বক্তিয়ার খান মিডিয়া-দিদিদের ভীড়ে ভীড়ে ছয়লাপ। ডাকাত-তাড়ানো নন্দ পিসি মুহূর্তে 'ফোক হীরোয়িন'। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী, আরো কত উপমা কাগজে কাগজে ঘুরছে। মাইকওয়ালারা দল বেঁধে 'স্পট ইন্টারভ্যু'র জন্য পিসিকে উত্যক্ত করে চলেছে। দু-চারটে নমুনা – "আপনার বন্দুক চালনায় শিক্ষাগুরু কে? "আমার ঈশ্বর শ্বশুরমশাই। নামটা তো বলতে পারবো না, পাড়ার থেকে জেনে নেবেন।" "কিন্তু অতদিনের পুরোনো বন্দুক চালু অবস্থায় ছিলো, তা কি ডাকাতির সম্ভাবনা ভেবে?" "তা কেন! আমার ঘরে তো কত পুরোনো জিনিসই পড়ে থাকে – খাট-পালঙ্ক, বাসনপত্তর, পুজোর সরঞ্জাম। আমি কি কোনোটায় এক কণা ধুলো জমতে দিই?" "আপনার প্রাণে ভয়ডর নেই? "তাই কি হয়, মানুষের শরীল তো! তবে শোনো বাছা, কোনো রক্তমাংসের প্রাণীকে এই নন্দ বামনি ডরায় না।" "মানে, আপনি কি ঐ অন্ধকারে ছায়া ছায়া যারা আসে তেনাদের কথা বলছেন?" "পাগল হয়েছো! মানুষকে যে ডরায় না সে ভিরমি খাবে ছায়া দেখে! ছায়ার কী খ্যামতা? ওরা তো দুই দাবড়ি দিলেই পালায়।" "তবে?" এই 'তবে'টা অর্থাৎ লৌহমানবী নন্দরাণী চৌধুরাণী তবে কিসে ডরান, সেটা কিন্তু অনেক জেরাতেও বের করা গেলো না।

কিছুদিন পর আবার তোলপাড় – সাহসিকতার জন্য যেসব মহিলা রাজ্যপালের মেডেল পাচ্ছেন, এ বছর তার মধ্যে রয়েছেন পিসি! দেবীপুরে আবার হৈ-হুল্লোড়, সবাই আবার এসে পিসিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পিসিও প্রথম প্রথম খুব খুশি। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো, যখন শুনলেন যে মেডেল নিতে সেই কলকেতায় যেতে হবে।

"সে তো নাকি অনেক দূর – কত রেলগাড়ি-বাসগাড়ি করে যেতে হয়।" চিন্তিতমুখে পিসি বললেন।

"অত ভাবছো কেন – দেবীপুর থেকে কলকাতা তো কত লোক এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছে। আমরা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবো" তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টায় বলে পিসির ছেলে আদিত্য।

তবে সেটুকু সংশয়ও দূর করে দিলো মুখুজ্জেবাড়ির মেজ ছেলে অনুপ। বাড়িটায় ফিল্মি শ্যুটিং করার ইচ্ছে তার মাথার থেকে যায়নি, বরং পিসির সাহসিকতার ফলে অকুস্থলে মিডিয়ার আনাগোনা জায়গাটার বেশ 'প্রোমো' করে দিয়েছে। তাই সে কিছুদিন পর আবার দেবীপুর এলো।
"এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনারা মোটেই মাথা ঘামাবেন না।" কৃতজ্ঞতায় গদগদ অনুপ বলে, "পিসি শুধু গ্রামের সম্মানই নন। আমাদের পরিবারের কাছে তো তিনি রক্ষাকর্ত্রী দুর্গা! ওনাকে আমি গাড়ি করে নিয়ে যাবো। আদিত্যদাও নয় সঙ্গে থাকবেন।"

ব্যস, এভাবে বিষয়টার ফয়সালা হবার পর পিসির কোনো ওজর-আপত্তিই টিঁকলো না। ঠিক হলো, নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ সামনের রোববার বেলা দু'টো নাগাদ সবাই অনুপের গাড়িতে রওনা দেবেন।

রোববার। যথারীতি বারোটার মধ্যে পিসির সামান্য মধ্যাহ্নের আহার শেষ হয়েছে। তিনি একটু বাগানে গেছেন কেচে দেওয়া কাপড়টা আনতে। বাইরে অপেক্ষা করছে মুখুজ্জেদের ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি, তাতে রঙীন কাগজ সেঁটে লেখা "জয়তু বিরাঙ্গনা শ্রীমতি নন্দরানি চৌধুরানি।" ড্রাইভার আর অনুপ রেডি। আদিত্য উত্তেজিতভাবে ঘড়ি দেখছে আর অপেক্ষা করছে মা ফিরে এলেই তারা রওনা দেবে। কিন্তু পিসি আর আসেন না।

"দাদা, একটু দেখুন না – এরপর দেরি হয়ে যাবে। পথে জ্যাম থাকলে –" একসময় অনুপ বলে। আদিত্য গলা চড়িয়ে ডাকে "মা" – কোনো সাড়া নেই। সে অগত্যা বাগানের পথে পা বাড়ায়। সেখানে গিয়ে দেখে, পিসি নেই! কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর আদিত্য সোরগোল জুড়ে দেয়, লোকজন ছুটে আসে।

এ কি ভোজবাজী নাকি? পিসি গেলেন কোথায়? চারদিক তো অভ্যর্থনাকারী মানুষের ভীড়ে ভীড়াক্কার, তার মধ্য দিয়ে কোথাও গেলে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো? "বাবা গো, পিসিকে ডাকাতে নিয়ে গেছে!" কে যেন ডুকরে ওঠে। "দুর বেঅকুফ, আমাদের এতজনের চোখের সামনে দিয়ে?" আরেকজন তাকে ধমক দেয়। এমন সময় কয়েকটি বাচ্চা হৈ-হৈ ক'রে ওঠে, "ঐ তো – ঐ যে পিসি!"

পিসি সজনে গাছের মগডালে বসে। কিছুতেই তাঁকে নামানো যাবে না। এক একবার সুসজ্জিত গাড়িটার দিকে তাকান আর ভয়ে বিস্ফারিত চোখে গাছের ডাল আরো শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেন।

"ওরে, ওই সব্বোনেশে গাড়ি – ওতে একবার চড়লে আর রক্ষে আছে! মেটেলের লোভে কি জল-জিয়ন্ত পেরানডা বিসজ্জন দেবো নাকি! ঘোড়া থাকলে কথা ছিলো, টগবগিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু ঐ কলের গাড়ি – বাপ রে!"

ঐ মগডালে ওঠে সাধ্যি কার! সুতরাং নীচের থেকেই চলতে থাকে লাগাতার কাকুতি-মিনতি।

কাজেই তোমরা যাঁরা সেদিনের অনুষ্ঠানের টেলিকাস্ট দেখেছো, হয়তো লক্ষ করেছো যে অসমসাহসিকা নন্দরাণী চৌধুরানির অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র আদিত্য চৌধুরী রাজ্যপালের কাছ থেকে মেডেল নিচ্ছেন। ঘোড়া আর চটজলদি কোথায় পাওয়া যাবে – তাই পিসির 'নিরাপদ যাত্রার' ব্যবস্থা এযাত্রায় আর করা গেলো না।

অনিরুদ্ধ সেন
থানে, মহারাষ্ট্র

অতি কৌতুহলের ফল

বিশ্বদীপ মামা বলল অতি কৌতূহল ভলো নয়। অতি কৌতূহলের ফলও ভালো হয়না। আমরা বললাম, কেন? এ ব্যাপারে গল্পের ঝুলিতে কিছু গল্প রয়েছে নাকি? শুনি তাহলে। বিশ্বদীপ মামার গল্পের ঝুলি কখনো খালি হয় না। অতি কৌতূহল বিষয়ক একটা গল্প ঝুলিতে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তবে গল্পটা ঝুলিতে ঢুকে পড়েছে কিভাবে সেটা কিন্তু বলতে পারব না।

শোন তবে, এই আতি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে একবার এক শীতের রাতে আমাকে দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

বল্টু বলল, কেন? তখনো সাইকেল আবিষ্কার হয়নি? নাকি, চালাতে জানতে না?

মামা বলল, অত অধৈর্য্য হচ্ছিস কেন? আরে গল্পটা তো ঐ সাইকেল নিয়েই। এই যা, আগে ভাগেই বলে ফেলেছি। এতে কিন্তু গল্পের স্বাদ কমে যাবে।

তো যা বলছিলাম। বলে মামা একটু ডান ও বাম দিক দেখে নিল। এর অর্থ এখনো চা কিন্তু আসে নি। এটা বুঝতে পেরেই আমি ভেতরে চলে গেলাম।

অনেক সময় শোনা গল্পগুলোও মামা আবার নতুন করে শোনায়। কখনো এর গল্প ওর গল্পও নিজের বলে চালিয়ে দেয়। যাই হোক, গল্পগুলো শুনতে ভালই লাগে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মামা বলল, ফিরছিলাম নবগ্রাম থেকে। ওখানে দিদির বাড়ি থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। শীতের রাত, রাস্তা প্রায় নির্জন। তাই বেশ জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিলাম। মাঝে প্রতাপপুর বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের এক ধারে বড় একটা ফুটবল মাঠ রয়েছে। মাঠটা বেশ সমতল ও বড়। আমারা অনেকবার এই মাঠে খেলা করে গেছি। এই মাঠের ধার ঘেঁষে রাস্তা।

সেই রাস্তায় যেতে যেতে দেখি মাঠের একটা গোলপোষ্টের মাথায় কে একজন পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। অল্প কুয়াশাও ছিল, তাই লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। সাইকেলের গতি কমিয়ে একটু দূরে সাইকেলটা একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর একটু করে এগিয়ে যেতে লাগলাম গোলপোষ্টের কাছে। ঐ যে কৌতূহল! আমাকে কৌতূহলে পেয়ে বসে। দিব্যি কাগজ-পেন নিয়ে লেখা-পড়া করছে। এ পাগল ছাড়া হয়না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের পাগলামী দেখার কোন মানে হয় না।

হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, যা ভাবছেন তা কিন্তু নয় স্যার। মুড়ির সঙ্গে মুড়কিকে গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। এ হচ্ছে সাধনা। শীতের রাত্রে গোলপোস্টে না উঠলে এ সাধনা পূর্ণ হয় না। আপনি তো স্যার নবগ্রাম থেকে ফিরছেন? ঠিক কি না।

এরপর আর লোকটাকে পাগল বালে মনে হচ্ছে না। ত ছাড়া ও জানলই বা কি করে যে আমি নবগ্রাম থেকে ফিরছি।

আমার কৌতূহল আরো এক ধাপ বেড়ে গেল।

আমি বললাম, সাধনাটা কি জানতে পারি কি?

ও এবার বলল, এক মিনিট। এক মিনিট পরেই জানতে পারবেন। এই খাতায় লিখে দিচ্ছি। তবে মাটিতে দাঁড়িয়ে এটা পড়া যাবে না স্যার। হালকা চাঁদের আলো ও কুয়াশা মিলেমিশে যে পরিবেশ তৈরী হয় এটা সেখানেই পড়তে হবে। তাই কষ্ট করে গোলপোষ্টের মাথায় উঠে আসতে হবে।

কৌতুহল মেটাতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। লোকটা গোলপোষ্ট ধরে সোজা নীচে নেমে এল।উঠুন স্যার, একটু কষ্ট হবে। বাহঃ, এই তো উঠতে পারছেন। উপরে পাইপের উপর খাতাটা ঝোলানো আছে। পড়ে চক্ষু সার্থক করুন।

চক্ষু সার্থক করাই বটে! খাতায় লেখা আছে, "আপনি এটা পড়ুন, আমি ততক্ষনে আপনার সাইকেলেটা নিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আর হ্যাঁ, অতি কৌতূহল ভালো নয়, এটা এবার বুঝলেন তো?
এই বলে বিশ্বদীপ মামা চা ও গল্প এক সঙ্গে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। আসিরে, অন্যদিন আসবো।

তরুণ কুমার সরখেল
আমডিহা, পুরুলিয়া

আনমনে: বুলু পুকুরে যাও

একবার সেজদার মাথায় ম্যাজিক ভর করল। আমার তখন কতই বা বয়স? ক্লাস টু বা থ্রি-তে পড়ি। আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ আগেকার কথা। যাই হোক, সেবার গ্রামের বাড়ি গিয়েই সেজদার পাল্লায় পড়লাম। আমায় পাকড়াও করে নিয়ে এল নিজের ঘরে – "এই দ্যাখ।" একটা দু'টাকার নোট তুলে দেখালো সেজদা – "এটাকে আমি ভ্যানিশ করে দেব।" উৎসুক চোখে দেখলাম সেজদা বিছানার ওপর একটা পরিস্কার সাদা কাগজ মেলে তার ওপর নোটটা রাখল। তারপর পাশের টেবিল থেকে একটা কাচের গ্লাস তুলে নিল – "এইবার..." সেজদা একটা ওস্তাদি হাসি হেসে বলল – "বল গিলি গিলি ছু।" আমিও দারুণ কিছু একটা ঘটবে এমন আশায় একদমে বললাম – "গিলি গিলি ছু।" আমার কথা শেষ হতে না হতেই সেজদা দু'টাকার সেই নোটের ওপর থপ করে গ্লাসটা উপুড় করে রাখল। আর কী আশ্চর্য! কাচের গ্লাসের নিচে নোটটা দেখাই যাচ্ছে না। একেবারে উধাও। বাইরে থেকে দেখছি গ্লাসের নিচে শুধু সাদা কাগজ। সেজদা এবার তাড়া দিল – "তাড়াতাড়ি বল গিলি গিলি ছু। নাহলে টাকাটা আর ফেরত পাওয়া যাবে না।" আমি আবার এক নিশ্বাসে বললাম – "গিলি গিলি ছু।" সেজদা গ্লাসটা উঠিয়ে নিল এবং বহাল তবিয়তে সেজদার সেই নোংরা দু'টাকার নোট সাদা কাগজের ওপর হাসছে।

আমি হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা দেখার চেষ্টা করতেই সেজদা গ্লাসটা উঠিয়ে টেবিলে রেখে দিল – "ম্যাজিকের সরঞ্জামে অন্য কারোর হাত দেওয়ার নিয়ম নেই। গুরুর বারণ।" আমার তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সেজদা নিজেই একটা পি. সি. সরকার হয়ে উঠেছে; তারও আবার গুরু আছে! সেজদা তার দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল – "সব ম্যাজিশিয়ানেরই গুরু আছে। আমার গুরুরও গুরু আছেন। তিনি এই মূহুর্তে গঙ্গার তলায়। গত দু'মাস ধরে আছেন।" সেজদার গুরুর গুরু জলের তলায় দু'মাস ধরে কী করছেন? পরে জনিদার মুখে জানা গেল বড় বড় ম্যাজিশিয়ানরা ঐভাবে নাকি দম ধরে রাখা প্র্যাকটিস করে। এই তো গতমাসেই আমাদের গ্রামে এক ছোটোখাটো জাদুকর মাটির

তলায় নিজের মাথা প্রায় একঘন্টা ঢুকিয়ে রেখছিল। শুনে আমি হাঁ। একঘন্টা! জনিদা বিজ্ঞের গলায় বলল – "টিনের চালের ওপর ঐ কুমড়োটা দেখছিস?" ৫ নম্বর ফুটবল সাইজ কুমড়োর দিকে আঙুল তাক করে জনিদা বলল – "সেই জাদুকরের কাছে অমন বড় একটা মাথার খুলি ছিল।" ব্যাপারটা এবার বোধগম্য হল। যে জাদুকরের কাছে ফুটবল সাইজের মাথার খুলি আছে, সে মাটির নিচে একঘন্টা কেন, দশ ঘন্টা মাথা গুঁজে রাখলেও মরবে না। কিন্তু সে সব বাইরের ম্যাজিশিয়ানদের ব্যাপার। আমাদের বাড়িতেই যে সেজদার মত ম্যাজিশিয়ান আছে, সেটা কী কম আশ্চর্যের!

জনিদা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলল – "ওসব ম্যাজিক আমিও দেখাতে পারি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল – "বিশ্বাস করছিস না মনে হচ্ছে। আয় তা হলে।" জনিদা আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল বড়কাকুর ঘরে। তারপর বড়কাকুর আলমারি ঘেঁটে একটা রুমাল বের করে আমায় বলল

– "খাওয়ার পর এই রুমাল দিয়ে তোকে এমন একটা ম্যাজিক দেখাবো যে হাঁ হয়ে যাবি।"

জনিদা কী ম্যাজিক দেখাতে পারে তাই ভাবতে ভাবতেই কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে খাওয়া শেষ করলাম। খুব বড় ম্যাজিশিয়ান হলে হয়ত উড়ুক্কু কার্পেটের মত সেই রুমালের ওপর চড়ে এদিক ওদিক উড়ে বেড়ানোর ম্যাজিক দেখাতেন। কিন্তু জনিদা তো আর অতবড় ম্যাজিশিয়ান নয়, এই সবে তার ক্লাস ফাইভ। হয়ত জনিদা রুমাল ঝেড়ে পায়রা উড়িয়ে দেখাবে। গাবলুর কমিক্সে এমন একটা ম্যাজিক ছিল। যাই হোক, খাওয়া শেষ করে ছোটমেজদার ঘরে আমি আর জনিদা হাজির হলাম। ছোটমেজদা এই সময় স্কুলে থাকে, তাই দুপুরে তার ঘরটা আমাদের দখলেই থাকে।

জনিদা বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে একটা দেশলাই কাঠি ধরল আমার সামনে – "হাতে নিয়ে দেখে নে। কোথাও কোনও কিছু ভাঙা নেই তো?" সতর্কভাবে পরীক্ষা করে কাঠিটা ফেরত দিলাম। নাঃ! গোটাগুটি একটা দেশলাই কাঠি। এবার সেই কাঠিটা রুমালের মাঝে রেখে জনিদা রুমালটা ভাঁজ করে আমার হাতে দিল। রুমালের মধ্যে কাঠিটা শক্ত হয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বিড়বিড় করে পড়ে নিয়ে জনিদা বলল – "এবার কাঠিটা ভেঙে ফেল।" আমি রুমালে জড়ানো সেই দেশলাই কাঠিটাকে ২-৩ জায়গায় ভেঙে দিলাম। আমার হাত থেকে রুমালটা ফেরত নিয়ে জনিদা আবার চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে রুমালটা খুলে ফেলল। এবং সত্যিই ম্যাজিক। রুমালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অক্ষত একটা দেশলাই কাঠি। তাহলে আমি যে রুমালের মধ্যে ভেঙে দিলাম কাঠিটা? জনিদা বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল – "তোর কী মনে হয় এই যে চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়লুম, সেটা কিছু নয়? এগুলো কি ভাঁওতা?"

আমি গদগদ স্বরে বায়না ধরলাম – "আর একটা ম্যাজিক দেখাও।" জনিদা একটা হাই তুলে বলল – "একসাথে বেশি ম্যাজিক দেখালে মুশকিল। রাতে ঘুম হবে না ভালো করে। তোকে বরং কাল একটা ম্যাজিক দেখাবো। পাকা কলা না ছাড়িয়ে খোসার মধ্যেই দেখবি টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে তোকে আমার একটা কাজ করতে হবে।"

কী কাজ?

আগামী পরশু থেকে আমাদের গ্রামের ক্লাবের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমি গ্রামের বাড়ি এসেছি সেই অনুষ্ঠান দেখব বলেই। আগের বার আসতে পারিনি। শুনেছিলাম দারুণ সব ব্যাপার হয়েছিল। তাই এবার বায়না করে বাপি-মাকে ছেড়ে একাই নদার সাথে এসেছি। বড়দিনের ছুটিতে স্কুলও বন্ধ। তাই নিশ্চিন্তে ৩ দিনের অনুষ্ঠান দেখে আবার বাগনানে ফেরা যাবে।

যাই হোক, জনিদা আমাকে আমার কাজ বোঝাতে আরম্ভ করল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন স্পোর্টস হয়। সারাদিন খেলাধুলোর পর বিকালে শুরু হয় গো এ্যজ ইউ লাইক – যেমন খুশি সাজার প্রতিযোগিতা। জনিদা এর আগের বছর কচ্ছপ সেজে ফার্স্ট হয়েছিল। জনিদা কচ্ছপ সাজল কী ভাবে? প্রথমে ভাঁড়ার ঘরে পড়ে থাকা পুরানো এক টিন আলকাতরা আর চুনকামের জন্যে ভিজিয়ে রাখা চুন জোগাড় করেছিল। তারপর মেজোকাকীমার মুরগির বাচ্চা চাপা দেওয়ার জন্যে একটা বড় ঝোড়া (বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বোনা বড় ঝুড়িকে আমরা ঝোড়া বলি) সেই আলকাতরা আর চুন দিয়ে কচ্ছপের খোলের মত রঙ করেছিল। তারপর জনিদা একটা থলের মধ্যে ঢুকে শুধু মুখটা বের করে ঝোড়ার নিচে গুটিশুটি মেরে ঢুকে পড়েছিল। ছোড়দি একটু কায়দা করে গুণ সূচ আর থলে সেলাই করা দড়ি দিয়ে ঝোড়াটাকে থলের সাথে আটকে দিয়েছিল। থলের চারটে কোণ কেটে দিতেই বেরিয়ে এল কচ্ছপের ছোট ছোট হাত-পা। তারপর আর কী, জনিদা গো এ্যাজ ইউ লাইকে কচ্ছপের মত হামাগুড়ি দিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল। তা এবারও জনিদার মাথায় দারুণ একটা প্ল্যান ঘুরঘুর করছে। সেটা ঠিকঠাক করতে পারলে ফার্স্ট প্রাইজ ঠেকায় কে। কিন্তু সেটার জন্যে সাথে আর একজন দরকার। আর জনিদা আমাকেই সেই সুযোগটা দিতে চায়। আমি কখনও স্কুলের স্পোর্টসে কোনও প্রাইজ পাইনি। এবার জনিদার পাল্লায় পড়ে হয়ত একেবারে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব। আমি তো একপায়ে খাড়া। তা কী সাজতে হবে?
জনিদা সাজবে গুন্ডা। আর আমি নিরীহ পথচারী। জনিদা একটা ছুরি বের করে আমার থেকে টাকা চাইবে। আমি টাকা দিতে চাইব না। আর জনিদা আমার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে। আমার পেট থেকে গলগল করে রক্ত বের হবে। শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। রক্ত বের হবে মানে? "আহ! সত্যি করেই রক্ত বের হবে নাকি? জামার নিচে তোর পেটের সাথে একটা বেলুনে আলতা গোলা জল থাকবে। আমি ছুরি দিয়ে বেলুনটা ফুটো করে দিলেই ফিনকি দিয়ে লাল জল বের হবে। দেখে মনে হবে সত্যি রক্ত। তুই শুধু পেটটা চেপে ধরে একটু কাতরাবি।"

বাহ! জনিদার মাথা বটে একখানা। খাসা প্ল্যান। শুনে মনে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েই যাব। কিন্তু এই রক্তারক্তি আমরা বেশিক্ষণ চালাব কীভাবে? আমাদের স্কুলের স্পোর্টসে মাঠের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গো এ্যাজ ইউ লাইক হতে দেখেছি। সেখানে যে যা খুশি সেজে মোটামুটি আধ ঘন্টা মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। বিচারকরা ঘুরে ঘুরে দেখে মার্কস দেন। কিন্তু জনিদার এই প্ল্যান তো খুব বেশি হলে ১-২ মিনিটে শেষ। তাহলে?

জানা গেল আমাদের ক্লাবের গো এ্যাজ ইউ লাইকটা একটু অন্যরকম। তুমি নিজের সাজ দেখানোর জন্যে এক মিনিট সময় পাবে। একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এসে প্রতিযোগীরা নিজের নিজের সাজ দেখাবে একের পর এক। "যেমন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয় আর কী।" – আমার বোঝার সুবিধার জন্যে জনিদা বলল।

যাই হোক, আমাদের সাজের জন্যে প্রস্তুতি দরকার। একটা ছুরি, একটা বেলুন, একটা আলতার শিশি আর লিউকোপ্লাস্ট। লিউকোপ্লাস্ট কেন? বেলুনটা পেটের সাথে ভালো করে আটকে রাখতে হবে। লিউকোপ্লাস্ট পাওয়া যাবে মেজদার ফার্স্ট এইড বক্স থেকে। সেটা সরানোর দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। ২টো বেলুন কেনা হল মানিক কাকুর দোকান থেকে (যদি একটা কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায়)। বেলুনের ২০ পয়সা গেল জনিদার পকেট থেকে। তার বদলে মেজোকাকীমার আলমারি থেকে আলতার শিশি হাতাতে হল আমায়। আর বড়কাকুর দেরাজ থেকে ফল কাটা ছুরি সরালো জনিদা। স্পোর্টসের একদিন আগেই সব সরঞ্জাম মজুদ, অথচ কেউ কিছু টেরও পেল না।

আসলে জনিদার কড়া নিষেধ আমরা কী করছি তা কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়। কারণ সেজদা

নিজেও গো এ্যাজ ইউ লাইকে কিছু একটা করবে। কী করবে আমাদের বলছে না। অতএব আমরাও কাউকে বলব না। বলা তো যায় না, আমাদের প্ল্যান শুনে আর যদি কেউ নকল করে দেয়? আমরা ছোট মেজদার বিছানায় সারা দুপুর রিহার্সাল দিলাম। জনিদা পাকা পরিচালকের মত বোঝাতে লাগল – "মুখটা আর একটু বাঁকা। পেটে ছুরি ঢুকলে অত কম যন্ত্রণা হয় নাকি?" আমার পেটে ছুরি ঢোকার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তাও প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরদিন দুপুরের খাওয়ার একটু পরেই আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। নীল দেওয়ার বালতিতে আলতা গুলে তার মধ্যে ফোলানো বেলুন ডুবিয়ে লাল জল ভরা হল। তারপর কষে বেলুনের মুখ বেঁধে আমার পেটে লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে সেটা সেঁটে দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য, পুরো কাজটাই করল জনিদা। তারপর বেলুনের ওপর জামা পরতেই দেখা গেল আমার পেটে একটা সন্দেহজনক ভুঁড়ি। জনিদা একটু ভেবে নির্দেশ দিল – "কুঁজো হয়ে হাঁট। ভুঁড়ি লুকিয়ে পড়বে। আর কুঁজো হয়ে হাঁটলে তোকে বেশ গরীব-গরীবও লাগবে।" এমনিতে জনিদার একটা পুরানো রঙ ওঠা স্কুল ইউনিফর্মের জামা-প্যান্ট পরেছি। এবার কুঁজো হয়ে আয়নার সামনে হেঁটে দেখতে লাগলাম যথেষ্ট গরীব লাগছে কিনা।

জনিদার বেশভূষা অবশ্য বেশ সুন্দর। ঈদে রাঙাকাকুর দেওয়া একটা নতুন জামার সাথে জিনসের প্যান্ট পরেছে। দেখে মোটেও গুন্ডা মনে হচ্ছে না। কিন্তু জনিদার মাথায় অদ্ভূত সব প্ল্যান খেলা করে। আমাদের গ্রামের রাস্তায় পিচ হচ্ছে তখন। ঠান্ডা হয়ে গেলে আলকাতরার বড় বড় ড্রামের গায়ে রাবারের মত পিচ আটকে থাকে। জনিদা কোত্থেকে সেই পিচ একটু জোগাড় করে এনেছে। হাতে গুলির মত করে পাকিয়ে বাম গালে থেবড়ে আটকে দিল। বাম গালে পিচের তৈরি আঁচিল নিয়ে জনিদাকে এক নিমেষে পাক্কা বদমাশ লাগছে এবার। পকেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে আমায় বলল – "চল।"

গো এ্যাজ লাইক হবে হাই স্কুলের মাঠে। আমাদের বাড়ি থেকে একটুখানি। জনিদা আগে থেকেই নাম লিখিয়ে এসেছিল। জানা গেল আমরা ৬ নম্বর প্রতিযোগী। বুকে ধুকপুক নিয়ে দেখছি আর কে কী সেজেছে। মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা বাঁশ আর দড়ি দিয়ে ঘেরে দেওয়া হয়েছে। ওর মধ্যে প্রতিযোগীরা নিজেদের সাজ দেখাতে ঢুকবে। তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দর্শক। প্রথমে এল একজন রাখাল। তার ২টো ছাগলের একটা চারদিকে এত ভিড় দেখে 'ম্যা গো' বলে ছুট দিল। বেচারা রাখাল নিজের সাজ দেখাবে কী, ছাগলের সাথে সেও ছুটলো। পরের জন বড় একটা দাড়ি মুখে এল, পিঠে লেখা রবীন্দ্রনাথ। তার পরের জন সেজেছে পাগল ভিখারি। একটা ছেঁড়াখোড়া লুঙ্গি পরে কালি মাথা গায়ে দর্শকদের দিকে তেড়ে এল।

একসময় আমাদের নাম ঘোষণা করা হল। প্রতিযোগিতার ঘেরা জায়গাটাতে ঢুকতেই জনিদা আমার কলার ধরে চেঁচাতে আরম্ভ করল আর আমি একটা ঢোক গিলে বেচারার মত মুখ করে বললাম – "আমার কাছে টাকা নেই।" আমায় ২-১ বার ঝাঁকুনি দিয়ে জনিদা পকেট থেকে ছুরিটা বের করে আমার পেটের বেলুনে খোঁচা দিল। কিছুই হল না। ছুরিটার ধার পরীক্ষা করা উচিত ছিল। নেহাতই ফল কাটা নিরীহ ছুরি সেটা। জনিদা আবার চেষ্টা করল। পেটে ছুরি মারার পরও কিছু হচ্ছে না দেখে দর্শকরা কেউ কেউ চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। মরিয়া জনিদা কলার ছেড়ে দিয়ে আমার পেটে এক মোক্ষম ঘুষি দিল। আচমকা এমন ঘুষিতে আমি ২-৩ ফুট দূরে গিয়ে মাটিতে পড়লাম। আর ব্লগাস শব্দে পেটের বেলুন ফেটে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। আমি উঠে জনিদাকে পালটা একটা ঘুষি লাগাব কিনা ভাবছি। এর মধ্যে দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ল। আমি নিশ্চিত হিন্দি সিনেমাতেও কেউ কারও পেটে ঘুষি মেরে রক্ত বের করতে পারেনি। যেহেতু সবাই প্রশংসা করছে আমিও জনিদার ঘুষি হজম করে উঠে পড়লাম। আমাদের কাজ শেষ।

এবার দেখতে হবে আর কে কী করছে। "আমরাই ফার্স্ট হব কী বলো?" জনিদা তার গাল থেকে আঁচিল ছাড়াতে ছাড়াতে বলল – "চিন্তা করিস না। যেভাবে লোকে চেঁচিয়েছে, তাতে জাজেরা আমাদেরই ফার্স্ট করে দেবে।" আরও কয়েকজন প্রতিযোগীর পর এল সেজদা। কিন্তু নেহাতই ভদ্রলোকের মত ফিটফাট সেজে। সেজদা কী সেজেছে?

ম্যাজিশিয়ান। জামা খুলে একটা শতরঞ্জি পেতে তার ওপর সেজদা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কোত্থেকে সে একটা এ্যাসিসটেন্ট জোগাড় করেছে। জনিদার কাছে শুনলাম, ছেলেটার নাম মন্টু। সাইকেল দোকানে কাজ করে। একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে মন্টু সেটাতে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরালো। তারপর সেই জ্বলন্ত খবরের কাগজটা মশালের মত সেজদার পিঠে আলতো করে ছুঁইয়ে দিল। সেজদার পিঠটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অথচ সেজদা নির্বিকার শুয়ে আছে। হাততালিতে ফেটে পড়ল গোটা মাঠ। আমি তখন হা-হুতাশ করছি। ইস! কেন যে সেজদার এ্যাসিসটেন্ট না হয়ে জনিদার পাল্লায় পড়লাম। ফার্স্ট প্রাইজ তো এখন সেজদারই বাঁধা।

কুড়ি-তিরিশ সেকেন্ড পর সেজদা হাত নাড়তেই তার এ্যাসিসটেন্ট এসে একটা বোতল থেকে জল ঢালতে লাগল সেজদার পিঠে। উদ্দেশ্য আগুন নেভানো। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল সেজদা পিঠে যে রাসায়নিক পদার্থটা ব্যবহার করে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল, তাতে নাকি জল ব্যবহার করা উচিত নয়। কম্বল জাতীয় ভারী কোনও কাপড় চাপা দিয়ে আগুন নেভানো উচিত ছিল। যাই হোক, জল ঢালতেই আগুন নেভার বদলে নতুন উদ্যমে দপ করে জ্বলে উঠল। আর সেজদাও ম্যাজিক ভুলে 'বাবা-রে মা-রে' করে তিড়িং-বিড়িং নাচতে আরম্ভ করল। প্রায় সন্ধ্যের মুখে আলো-আঁধারিতে সেজদার আগুন পিঠে সেই নাচ অদ্ভূত সুন্দর লাগছিল। আগুন নেভানোর কথা ভুলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সবাই দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর "জল আন", "মাটিতে গড়াগড়ি দে", "শতরঞ্জিটা চেপে ধর" ইত্যাদি হাজারো উপদেশ ভেসে আসতে লাগল। এদিকে আগুনের জ্বালায় সেজদা মাঠের মধ্যে ছুটতে আরম্ভ করেছে। নিজের গা বাঁচাতে জনতা ছত্রখান।

এমন সময় মাইকে ভেসে এল ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি মালেক কাকুর গলা। সেজদাকে উদ্দেশ্য করে মালেক কাকু তারস্বরে চেঁচাচ্ছে – "বুলু পুকুরে যাও। বুলু পুকুরে যাও।" এবং এই উপদেশটা কাজ লাগল। স্কুল মাঠের লাগোয়া পুকুরে আগুন পিঠে সেজদা ঝাঁপ দিল। পুকুরে পড়ে আগুন নেভার সাথে সাথে আরও কয়েকজন ঝপ-ঝপাং করে ঝাঁপ দিল সেজদাকে টেনে তুলে আনার জন্যে।

সেই ঘটনার পর কত বছর কেটে গেছে। পিঠ পুড়িয়ে সেজদাও সেই কবেই ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দিয়েছে। বড় হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে ছোটবেলার সব ম্যাজিকগুলো হারিয়ে গেছে এক-এক করে। কিন্তু সব কিছুই যে একেবারে পালটে গেছে তা নয়। এতগুলো বছর পরও আড়াল থেকে গম্ভীর স্বরে "বুলু পুকুরে যাও" হাঁক দিলেই সেজদা বিলক্ষণ রেগে যায়।

রোহণ কুন্দুস
কলকাতা

ধারাবাহিক: মেঘ-বৃষ্টির দেশে... (পর্ব-১)

ছোট্ট ছোট্ট শাদা মেঘের নৌকা আমার পাশ দিয়ে, হাতের কাছ ঘেঁষে নীল আকাশে ডিঙি বেয়ে এগিয়ে চলেছে। আমি চুপটি করে প্লেনের জানলার কাছে বসে ভাবছি তোমার কথা সিরাজুল। ভাবছি তুমি আর আমি এমনি এক বর্ষার দিনে সুন্দরবনের হরিণভাঙা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। তাও কতদিন আগে তাই না? হ্যাঁ তখন তোমার এখনকার মতো গোঁফের রেখা ওঠেনি সিরাজুল। ওমা, ওকি লজ্জা পেলে নাকি? ধুর বোকা, আমি তো গল্প করছি তোমার সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো না তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার সদ্য ওঠা গোঁফে কেমন করে তা দাও। আর তোমার বোন আনন্দি লুকিয়ে সেটা দেখে ফেললেই তার ওপর তর্জন গর্জন করো। ওকি...চললে কোথায়? আচ্ছা ঠিক আছে এই কান ধরছি সিরাজুল আর বলবো না। সত্যি আর বলবো না দক্ষিণ রায়ের মিশ কালো গোঁফের মতো তোমার গোঁফটাও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হবে আর আমার সেই ছোট্ট সিরাজুল, যে আমাকে শোনাতো কুমীরের গল্প তার গোঁফ দেখতে আমার মনটা উড়তে চাইবে আকাশে। এই বর্ষার সকালে ছুট্টে চলে যেতে চাইবে সুন্দর বনে। ওই দেখ আবার রাগ করে! বুঝতে পারছো না এটা গল্প...আরে বাবা আমি সত্যি সত্যি তো উড়ছি আকাশে।

এর আগে আমি কোনোদিন প্লেনে উঠিনি জানো। অনেক দিন আগে থেকেই মনটা খুশিতে নেচে উঠছিলো, তারপর আবার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছিলো। অতো ওপর দিয়ে যেতে যেতে তোমার সুন্দর বনের সেই দুষ্টু ঈগলটার সাথে যদি দেখা হয়ে যায়। পাইলট মানে যিনি প্লেন চালান, তাঁর গুরু গম্ভীর কন্ঠে বলে দিলেন বাইরের আবহাওয়া খুব খারাপ, বৃষ্টি পড়ছে, তাই কেউ দুষ্টুমি করবে না, সবাই প্লেনের সিট বেল্ট বেঁধে চুপটি করে বসে থাকবে। তুমি জানো সিরাজুল একটু পরেই প্লেন দৌড়োতে শুরু করলো সাঁ সাঁ...আমি ভাবলাম ওমা, এটা আবার দৌড়ায় কেনো? উড়বে তো! পাশের বন্ধু বিরক্ত হলো। আর ঠিক তোমার মতো বকে দিলো সিরাজুল। আমি দেখলাম এক ঝাঁকুনিতে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্লেন...। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, অনেক নীচে... আমার পায়ের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে আমার প্রিয় শহর, আমার মন কেমনের সব কিছু। আচ্ছা সিরাজুল এই যে এতোক্ষণ আমি বক বক করে তোমার মাথা ধরিয়ে দিলাম তবুও কি তুমি আমায় বলবে না এই বছরে খলসি ফুলের মধু রেখেছো কিনা আমার জন্যে? বলবে না তো আনন্দি এখোনো তার সেই ছোট্ট ডিঙাতে মাছ ধরতে যায় কিনা? রাতের বেলায় কুপি জ্বালিয়ে তোমরা দুই ভাই বোন পড়তে বসো কিনা দাওয়ায়? এখোনো কি সেই দুষ্টি বাঘটা এসে গ্রামের বাইরে হালুম হালুম করে ভয় দেখায়? ও আচ্ছা রাগ হয়েছে? অনেকদিন চিঠি লিখি না তাই? কী করবো বলো? আমিও তো অনেকদিন কোথাও

বেরোয়নি। সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি দিয়ে আমাকে কে যেনো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো অনেক দিন। আমার পোষ্ট বক্সে অনেকদিন কেউ বেড়ানোর চিঠি রেখে যাইনি যে সিরাজুল। তাই একদিন সকালে আমার মোবাইলের ইনবক্সে যখন মেঘালয় থেকে উড়ে এলো নেমনতন্নের চিঠি তখন আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। বাইরের কদম ফুলের গাছা হাওয়ায় পাতা নেড়ে বলেছিলো এবার তুমি বেরিয়ে পড়ো টুকনু। খেয়াঘাটের বুড়ো মাঝি বলেছিলো থেমে থেকোনা বাবু...নদী কি থেমে থাকে? সে কেমন আপন মনে একা একা বয়ে চলে সবাইকে নিয়ে। আমিও আপন মনে বয়ে চলছি সিরাজুল। হ্যাঁ এই তো দেখো না, আমাদের প্লেন নামবে এবার গৌহাটি বিমান বন্দরে। এই তো আমি ওপর থেকে দেখতে দেখতে পাচ্ছি বক্ষ্মপুত্র নদীকে। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে আমি এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে। ঝির-ঝিরে বৃষ্টি আমার জানলা ধুয়ে দিচ্ছে। আর আমার কানের কাছে শিরশিরে হাওয়া বলে যাচ্ছে, মেঘ বৃষ্টির দেশে তোমাকে স্বাগত টুকনু।

তুমি কি বিরক্ত হয়ে পড়ছো সিরাজুল? আমি জানি তুমি যত রাগ করেই থাকো না কেনো আমার নীল খামের চিঠিটা তুমি এতোক্ষণে রফিকুল, আনন্দি এদের সবাইকে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছো। গৌহাটি থেকে নেমে আমরা যাবো শিলং। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আনন্দ। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার। সেই আমাদের নিয়ে যাবে শিলং। গাড়িতে চেপে বুঝতে পারলাম খিদে পেয়েছে। একটু পরেই শহর ছাড়তেই পথের ধারে পাহাড় আর জঙ্গল আমার অনেক অনেক চেনা কিছু ছবি মনে করিয়ে দিলো।

আমার মনে পড়ে গেলো উত্তরবঙ্গের চিলাপাতার কথা। জঙ্গলে ঘেরা গ্রামের কথা। আন্দু রাভা, জয়ন্তী মেচ, সুনীল নার্জিনারিন, হেমবং টোটো, ফুলমণি মেচ সবার কথা। মনে মনে ঠিক করলাম আর আমি সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির ছোঁওয়ায় ঘুমিয়ে থাকবো না সিরাজুল... বেরিয়ে পড়বো আমার পিঠের সেই বড় বোঁচকাটা নিয়ে। আবার সবার সাথে দেখা করবো। আবার তিস্তার চরে সবার সাথে কাশ ফুলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে বেড়াবো। আনন্দ গাড়ি থামালো। আনারস বিক্রি হচ্ছে। খুব মিষ্টি আনারস খেলাম আমরা। এখানে আনারস খুব শস্তা। বর্ষার যেসব ফল হয় আনারস তার মধ্যে প্রধান।

রাস্তার চারপাশে জঙ্গল, পাহাড় দেখতে দেখতে আর আনন্দের গল্প শুনতে শুনতে কখন যে চলে এসেছি শিলং বুঝতেই পারিনি। টিপটিপ বৃষ্টি আর শীত শীত ঠান্ডা হাওয়া আমাদের নিয়ে চললো পুলিশ বাজারের দিকে। ওকি আবার পুলিশের কথা শুনে ভয় পাচ্ছো। নানা সিরাজুল পুলিশ বাজার নাম শুনেই ভেবো না সব কিছু পুলিশদের। আসলে এটা শিলংয়ের সবচেয়ে বড় বাজার। অনেক কিছু বিক্রি হয় এখানে। আর এখানেই হোটেল পাইন বোরোতে আমরা কিছুদিন থাকবো। আনন্দকে ফিরতে হবে গৌহাটি...অনেক খানি রাস্তা। চলে গেলো সে। কথা থাকলো আবার দেখা হবে, গৌহাটিতে, মাত্র কয়েকদিন পরেই।

কে যেনো একটা ঠান্ডা হাত পিঠে রাখলো। পেছন ফিরে দেখি, এখানকার খাশিয়াদের মতো সুন্দর দেখতে বাপী। হ্যাঁ এবার তার ট্যাক্সিতেই আমরা শিলং দেখবো। বাপী আমাদের নিয়ে গেলো ইন্টারন্যাশানাল গলফ মাঠে। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার বাড়িতে। এখানে বেশ কিছুদিন কবি ছিলেন। লিখতে শুরু করেছিলেন শেষের কবিতা। বড় হয়ে সে না হয় তুমি পোড়ো। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলো সিরাজুল। তারপর থেকে একটুও ঘুম এলো না আর। কারণ কাল সকালে উঠেই যে আমরা যাবো চেরাপুঞ্জি। সেই কবেকার ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি...। বাইরে বিদ্যুত চমকাচ্ছে।

বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে আমার ঘরের কাঁচের জানলায়। সেই তুমুল বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মধ্যে হঠাত ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভুল শুনছি না তো? না, ওই তো আবার। ঠক ঠক...। এতো রাতে দরজায় আওয়াজ করছে কে? শরীরের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো। হোটেলে ভূত-টুত নেই তো? বালিশের পাশ থেকে হাতড়ে টর্চটাকে খুঁজে বের করলাম। ধুর ছাই, কাজের সময় বিগরোবে। জ্বলছে না। আবার আওয়াজ, ঠক...ঠক...ঠক...। শরীরের মধ্যে দিয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো। আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে যাবো আর ঠিক সেই সময় কড়কড় করে বাজ পড়লো। দমকা হাওয়ায় খুলে গেলো দরজা। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগলো আমার মুখে। সেই আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম তালগাছের মতো লম্বা একটা কি যেনো। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। (চলবে)

লেখা ও ছবি
কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

বইপোকার দপ্তর: চিরকালের সেরা-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংখ্যা থেকে শুরু হল বইপোকার লাইব্রেরী। এই বিভাগে বইপোকা তোমাকে দেবে নতুন পুরনো ভাল ভাল বইয়ের হদিশ।

এই সংখ্যায় যে বইটা নিয়ে আমি আলোচনা করব, সেটা মোটেও কোন নতুন বই নয়। বেশ পুরনো। কিন্তু ক্লাসিক। তাই ভাবলাম, পুজোর নতুন জামা-জুতো-পূজাবার্ষিকীর গন্ধের মধ্যে না হয় একটু পুরনো বইয়ের গন্ধও মিশিয়ে দেওয়া যাক।

বইয়ের নাম 'চিরকালের সেরা'; লেখক - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক-শিশু সাহিত্য সংসদ। অবিন ঠাকুরের লেখা গল্প হয়ত এক-আধটা তুমিও পড়েছ। যেমন 'ক্ষীরের পুতুল' বা 'বুড়ো আংলা'। এই বইটার মজা হল, এই বইতে শুধুমাত্র অবনীন্দ্রনাথের লেখা সেরা গল্পগুলিই নেই, সাথে আছে 'পুথিপালা' আর 'স্মৃতিচিত্র' নামে আরো দুটি বিভাগ, যেখানে আছে ছোটদের জন্য লেখা মজাদার নাটক আর নানা স্মৃতিকথা। বইয়ের প্রকাশকের সাথে আমিও একমত, এই বই শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও পড়তে সমান ভাবে ভাল লাগবে।

বইপোকা

বিদেশী-রূপকথা: গম্ভীর রানীর গল্প

অনেক দিন আগের কথা, চীন দেশে ছিল এক রাজা। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজ্যজুড়ে সুখ আর শান্তি। রাজার প্রজা প্রতিপত্তি সব ছিল। ছিল না শুধু মনে সুখ। রাজার খালি থেকে থেকে বড় একা লাগত। আসলে সেই দেশের রাজার সব ছিল, ছিল না শুধু এক রানী। তাই এই মনের অসুখ। একদিন রাজা ঠিক করলেন যে তাঁর সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে যাবেন রানীর সন্ধানে। যেমনটি ভাবা তেমনটি কাজ। রাজা তাঁর সব চেয়ে তেজী ঘোড়াটা আর তাঁর সাতজন সবচেয়ে বিশ্বাসী আর বলিষ্ঠ সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পরলেন রানীর সন্ধানে, দেশ থেকে দেশান্তরে। নানান দেশে যান। কত দেশের কত সুন্দরী রাজকন্যে। তাদের নানান গুণ। কিন্তু রাজার মন ভরে না। কোথাই সেই মেয়ে যে রাজার মনে এনে দেবে দু দণ্ডের শান্তি, সেই সুখ। একদিন রাজা তাঁর সৈন্যসামন্তদের নিয়ে এসে পৌঁছলেন এক হ্রদের তীরে। সন্ধ্যা নেমে আসছিল, তাই তিনি ঠিক করলেন রাতটা এখানেই থেকে যাবেন। সৈন্যদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন হ্রদের ধারে তাঁবু খাটাতে। রাত্রে খাবার আয়োজন চলছে, এমন সময় রাজার কানে এল এক অদ্ভুত সুন্দর সুর। রাজা সেই সুরের খোঁজে হ্রদের কাছে এসে দেখলেন একটি মেয়ে চাঁদনী আলোয় হ্রদের মধ্যে ছোটো এক নৌকা বিহার করছে। চাঁদের আলোয় সেই মেয়ের অপূর্ব মায়াবী মুখখানি দেখে রাজার বুকে অচেনা এক ঢেউ চলকে উঠল। যেন এই মেয়েকেই তিনি খুঁজে চলেছিলেন এতদিন। এই মেয়েটিই গাইছে সেই অদ্ভুত মিষ্টি গান। রাজা তাঁর সৈন্যসামন্তদের ডেকে বললেন, মেয়েটিকে ডেকে আনতে।

নৌকাটি তীরে এসে পৌছল। রাজা মেয়েটিকে হাত ধরে নিয়ে এলেন পাড়ে, নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সাথে নৈশভোজের। মেয়েটি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে রাজার সাথে তাঁর তাঁবুতে এসে বসল। রাজা নানান কথার মাঝে তাকে তাঁর ভাললাগার কথা বললেন। বললেন তাকে তাঁর রানী করে দেশে নিয়ে

যেতে চান। মেয়েটি শুনে জিজ্ঞেস করল তিনি তো তাকে আজই প্রথম দেখলেন, তাকে ঠিক মত চেনেনও না, তবে কেন তাকেই রানী করতে চান? সেই শুনে রাজা মেয়েটি কে সব খুলে বললেন। এও বললেন তিনি বহু দিন ধরে তারই মতো কাউকে খুঁজে চলেছিলেন দেশ-বিদেশে। রাজা তাকে আসস্থ করলেন তিনি তাঁর সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখবেন। তার সমস্ত সুখের খেয়াল রাখবেন। সেই শুনে মেয়েটি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হল। রাজার আনন্দ আর ধরে না। পরদিন ভোরবেলা তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর রাজধানীর পথে। কিন্তু এতো কথার মাঝে রাজা তো ভুলেই গেছেন মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করতে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি জানালো তার নাম জীনা। সে নানান দেশ এ ঘুরে এখানে এসেছে। কিন্তু এর বেশি সে আর কোন কোথাই বলল না। রাজা লক্ষ্য করলেন জীনা চুপচাপ। তেমন কোন কোথাই বলছে না। রাজা তাঁকে তার বিশণ্ণতার কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলল "চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

রাজা ফিরে এলেন দেশে। বিয়ে করলেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মেয়েটিকে। দেশ জুড়ে তিনদিন ধরে চললো আনন্দের উৎসব। সবাই ভীষণ খুশী নতুন রানীকে পেয়ে। নানান রঙে নানান খুশীতে ভরে উঠল রাজার মন। কিন্তু হায়...রানীর মুখে কোথাও হাসির দেখা নাই। রানী তাঁর সব কর্তব্য সব দায়িত্ব নিপুণ হাতে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রানীকে পেয়ে রাজ্যের সব প্রজা ভীষণ খুশী। কিন্তু, রানীর মুখে এক অদ্ভুত বিশণ্ণতা। রানীকে রাজা বহুবার জিজ্ঞেস করেছেন, তাঁর কি এই প্রাসাদে কোন অসুবিধা বা মনে কোন দুঃখ আছে কিনা। রানী তাঁর কোন উত্তরই দেন না। চুপ থাকেন।

রাজা তাঁর রানীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে কতকিছু করলেন, কত ভেলকিবাজি কত মশকরা দেখালেন, কিন্তু রানীর মুখে হাসি নেই। রাজার কোন পন্থাই কাজে দিল না রানীর মুখে হাসি ফটাতে। একদিন রাজার মাথায় এক অভিনব পন্থা এল রানীর মুখে হাসি আনার। তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্থ উপদেষ্টাকে ডেকে বললেন সন্ধ্যেবেলা তিনি যখন তাঁর নিজের কক্ষে থাকবেন রানীর সাথে তখন সে যেন এসে বলে বিদেশী সৈন্যরা এসে দরজায় উপস্থিত, তাঁর প্রাসাদ দখল হতে চলেছে।
সেইদিন নৈশভোজের পর রাজা তাঁর রানীকে নিয়ে তাঁর শয়নকক্ষে ছিলেন। রাজা তাঁর পালঙ্কে বসে হস্তাঙ্কন অভ্যাস করছিলেন আর রানী তাঁর এলো চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর পারিষদ দৌড়োতে দৌড়াতে এসে বলল –

"মহারাজ, বিদেশী সৈন্যরা এসে প্রাসাদের দরজায় প্রাসাদ দখল করতে এসেছে, তাড়াতাড়ি চলুন।" এই শুনে রাজা তাড়াহুড়ো করে পালঙ্ক থেকে উঠতে গেলে তাঁর দোয়াত উল্টে সমস্ত কালি চোখেমুখে লেগে গেল। তাই দেখে রাণী হাসিতে ফেটে পরলেন। রাজা রাণীর এই হাসি দেখে আনন্দে লাফালাফী করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর পন্থা কাজে দিয়েছে। তিনি রাণীকে সব খুলে বললেন যে তিনি তাঁর মূখে হাসি ফোটানোর জন্যে এই কীর্তি করেছেন। সেই শুনে রাণী দ্বিগুণ হাসিতে ফেটে পরলেন।

কিন্তু পরদিন রাণীর মুখে আবার সেই বিষণ্ণতা ফিরে এলো। রাণীর মুখে হাসি আবার কোথাই হারিয়ে গেল। রাজা ভাবলেন রাণীর অতীতে নিশ্চয় কোনো দুঃখর ঘটনা ঘটেছে, তাই তাঁর এই বিষণ্ণতা বারবার ফিরে আসে। এমন সময় রাজার এক দূত ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল – "মহারাজ, বিদেশী সৈন্য এসে সিংহদুয়ার দখল করেছে, আর বেশী দেরী নেই প্রাসাদ দখল করতে।" রাজা ভাবলেন সে বোধহয় রাণীর মুখে হাসি ফেরানোর জন্যে এই কথা বলছে। রাজা বললেন – "এই কথায় রাণী আর হাসবেনা দূত, অন্য উপায় ভাব।" কিন্তু হায়! কোন উপায় নাই। দূত বলল – "মহারাজ এবার সত্যই বিদেশী সৈন্য প্রাসাদ আক্রমণ করেছে।। রাজা বাইরে এসে দেখলেন তাঁর প্রাসাদ বিদেশী সৈন্যরা

ঘিরে ফেলেছে। কামানের গোলা এসে পড়ছে প্রাসাদের গায়ে।

রাজা চিৎকার করে তাঁর সৈন্যদের ডাকলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিদেশী রাজা এসে রাজার সৈন্যসামন্তদের মেরে ফেললেন। রাজাকেও তাঁর হাতে প্রাণ দিতে হলো। বিদেশী রাজা এসে তাঁর রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, এমনকি তাঁর রাণীও দখল করে বসল। রাজা তাঁর রাণী জিনার হাসির মাসুল দিলেন।

চীনের রূপকথা
অনুবাদ ও ছবিঃ
অনন্যা দত্ত
কলকাতা

পুরাণকথা: কুসুম আর শী-দের গল্প

স্কটল্যান্ড জায়গাটা ভারী সুন্দর। এখানে ঝোপে ভরা পাহাড়চূড়াগুলি ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ে বসে থাকে; সবুজ ফার্ণগাছগুলি মানুষের সমান লম্বা হয়ে নদীবহুল উপত্যকাগুলিকে ঢেকে রাখে। এরকম জায়গা পরীদের খুব প্রিয়, বেশ মানুষের চোখের আড়ালে গোপনে থাকা যায়। আর সত্যিই, সেজন্যই স্কটল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশগুলিতে পরীদের বেশ ভীড়। পরীরা কেউ দয়ালু, কেউ পরশ্রীকাতর, আর একদল আছে, যাদের স্কটরা 'শী' বলে ডাকে, তারা জ্ঞানী, বৃদ্ধ ও অনেক ক্ষমতার অধিকারী।

অনেকদিন আগে একবার দুজন শী মহিলা এইরকম পরিবেশে রাংচিতার বেড়া দেওয়া গ্রামের বাড়িগুলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বড় বড় বাদাম গাছের তলায় তাদের লুকোচুরি খেলা বেশ জমে উঠেছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। খুঁজে পেতে দেখা গেল, একটা বড় গাছের তলায় ভাল করে পশমী শালে জড়ানো এক ছোট্ট মানবশিশু, শুয়ে শুয়ে চিৎকার করছে। ধারে পাশে কেউ নেই। তারা যখন বাচ্চাটিকে দেখার জন্য নিচু হয়েছে, বাচ্চাটি তাদের দেখে আনন্দে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

পুঁচকে বাচ্চাটাকে দেখে পরী মেয়েরা তো একেবারে মোহিত হয়ে গেল। একজন বলল, "ধারে পাশে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় বাচ্চাটাকে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে।" আরেকজন বলল, "কেউ যখন দাবি করতে আসছে না, তখন ও আমাদেরই হল।" তারা চট্‌ করে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে শী-দের দেশে চম্পট দিল।

একটু পরেই বাচ্চার মা, ধরো তার নাম কুসুম, এসে হাজির। সে রান্নাঘরের জন্য কিছু ডালপালা কুড়োবার জন্য সামান্য একটু দূরে গিয়েছিল। ফিরে এসে বাচ্চাকে না দেখে সব জায়গায় আতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। অন্ধকার নেমে এল; কাঁদতে কাঁদতে সে

বাড়ি ফিরে এল। প্রতিবেশীদের সমস্ত ঘটনা জানালে পরদিন ভোর হতেই সকলে শিশুটিকে খুঁজতে তরুণী মায়ের সঙ্গে বেরোল। তারা ঝোপে ঝাড়ে, লম্বা ফার্ণের জঙ্গলে, সর্বত্র খুঁজল; চেনাশোনা সমস্ত পথিককে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু শিশুটি যেন একেবারে উবে গেল। এক সপ্তাহ ধরে দিন-রাত্রি এক করে খুঁজেও শিশুটির কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলনা। ক্রমে সবাই আশা পরিত্যাগ করল; শুধু মায়ের মন তার হারাধনের আশায় অতন্দ্র হয়ে রইল।

সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, কুসুম ঠিক করল তাকে একাই যেতে হবে বাচ্চার খোঁজে; প্রয়োজন হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সে যাবে। কোথাও, কখনও সে খুঁজে পাবেই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে। এ পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কে আছে মায়ের, স্বামীও তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। গ্রাম থেকে শহরে, তার থেকেও দূরে দূরান্তরে শুরু হল বেচারী মেয়েটির একা পথ চলা, জনে জনে জিজ্ঞাসা করা; কিন্তু কেউই হারিয়ে যাওয়া শিশুটির কথা বলতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌঁছাল ভবঘুরে বেদেদের শিবিরে। সে জানত এইসব লোকেরা দেশ-দেশান্তর ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাই হয়ত জানতেও পারে, এই আশায় তাদের জিজ্ঞাসা করল তার হারিয়ে যাওয়া শিশুর সংবাদ। কিন্তু তাদের কাছেও তো এর জবাব নেই। তবে এই দয়ালু লোকগুলি যখন তার কাহিনী শুনল, তাদের কুসুমের জন্য খুবই দুঃখ হল। তাই তারা যখন উত্তর দিকে যাত্রা করল, তখন তাকেও সেই বেদেদলের সঙ্গে নিয়ে গেল। আশা, তাদের দলের অন্য একটি শিবিরে যে এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধা থাকেন, যাঁর কাছে পৃথিবীর সব জ্ঞান গচ্ছিত রয়েছে, তিনি যদি কোনো হদিস দিতে পারেন।

অনেকদিন ধরে চলে বেদের দল উত্তরের শিবিরে পৌঁছাল। মেয়েটিও আশায় বুক বেঁধে এল সেই প্রাচীনার সঙ্গে দেখা করতে। লক্‌লকে আগুনের পাশে এক বৃদ্ধা গুঁড়িসুড়ি মেরে বসেছিলেন। বয়সের ভারে তাঁর শরীরটা কুঁচকে গিয়েছিল, চামড়া হলুদ হয়ে আঁকিবুকি রেখায় পুরোন ভূর্জপত্রের মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যখন তার ইতিহাস শোনাচ্ছিল, তখন তাঁর বলিরেখা ভরা মুখে চোখদুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে ঝক্‌ঝক্ করছিল।

সব কথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। মেয়েটির মনে হতে লাগল, হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন নয়তো বহুবিলম্বিত মৃত্যু অবশেষে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। শেষপর্যন্ত তাঁর নীরবতা ভাঙ্গল, মনে হল যেন বহুদূর থেকে তাঁর কন্ঠ ভেসে এল।

"বেচারা খুকুমনি, তোমার বাচ্চাকে শী-পরীরা চুরি করে নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। সেখানে যারা একবার যায়, তারা প্রায়শই আর ফিরে আসে না। তাকে পাবার আশা ত্যাগ করো।"

চিৎকার করে কেঁদে কুসুম বলে উঠল, "আমার প্রাণ থাকতে আমি তার খোঁজ করা ছাড়ব না। আমি জানি, শী-রা খুব শক্তিশালী। কিন্তু আপনার কাছেও তো আছে বহু বছরের সঞ্চিত জ্ঞান। তাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আমায় কিছু জাদুশক্তি দিন না?"

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, "শী-দের বিরুদ্ধে আমার কোন জাদুশক্তিই কাজে লাগবে না। তবে একটা মাত্র উপায় আছে, যার দ্বারা তুমি তোমার সন্তানকে ফিরে পেতে পার।"

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। তারপর বৃদ্ধা বেদেনী সেই মেয়েটিকে শী-দের কথা বললেন। খুব শীঘ্রই শী-দের দেশে এক বিরাট সম্মেলন হবে। দেশের প্রতিটি কোন থেকে সেখানে পরীরা জমায়েত হবে পরবর্তী একশ বছরের জন্য তাদের নেতা নির্বাচনের জন্য। এসব শুনে বিভ্রান্ত মেয়েটি বলে উঠল,

"কিন্তু এর সঙ্গে আমার বা আমার বাচ্চার সম্পর্ক কি?"

"ধৈর্য ধরো মা, শী-দের একটা দুর্বলতার কথা তোমায় বলি শোনো। কোনো মানুষ কিন্তু এখবর জানে না," খল্‌খল্‌ করে হেসে বৃদ্ধা বললেন, "শী-দের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান ও ক্ষমতা থাকলেও তারা নিজেদের জন্য কিছুই তৈরী করতে পারেনা। তাই কোনো কিছু পেতে গেলে তারা হয় সেটা ভিক্ষা করে পায় বা চুরি করে। এই পরীগুলো খুব দাম্ভিক আর তারা খালি সেই সব জিনিষ পেতে চায় যেটা পৃথিবীতে আর কারো কাছে নেই। যদি তুমি এই পৃথিবীতে তেমন কিছু পাও তবে সেটার বদলে তুমি বাচ্চাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করতে পার।"

দুঃখী মেয়েটি করুণ মিনতি করে বলে উঠল, "হে প্রজ্ঞাময়ী, দয়া করে আমাকে বলুন, কোথায় পাবো এমন জিনিষ। আর জিনিষটা যদি বা পাই, কিভাবে সেদেশে পৌঁছাব?"

"বাছারে, সেটা তো আমি বললে হবে না। এই অসামান্য জিনিষটা কোথায় পাবে, তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। এছাড়াও শী-দের দেশে ঢুকবার রাস্তা জানতে গেলেও এইরকমই আরেকটা অনবদ্য বস্তু উৎকোচ হিসেবে দিতে হবে তোমাকে। তবে এখানে আমি তোমায় একটু সাহায্য করতে পারি। যাত্রাপথে তোমার যে কোনো রকম বিপদ থেকে রক্ষার উপায় আমি করব" - এই বলে বৃদ্ধা বেদেনী মেয়েটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এভাবেই তিনি তাকে এমন এক জাদু রক্ষাকবচ দিলেন যেটা তাকে জল, স্থল, আগুন বা বাতাস থেকে আসা যেকোন বিপদ থেকে বাঁচাবে।

এবার বেদের দল যে যার পথে রওনা হয়ে গেল। কুসুম একা একটি মেয়ে, এক সন্তানহারা মা, আকাশের তলায় বসে ভাঙা শিবিরের অগ্নিকুন্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসল এবার তার কি করণীয়। দুটো জিনিষ তার চাই - একটি তাকে দেবে পরীর দেশে ঢুকবার পথের সন্ধান, আর দ্বিতীয়টি তাকে এনে দেবে হারানো সন্তানকে। কত অদ্ভুত জিনিষের কথা তার মনে পড়ল, যেগুলির কথা সে আগে শুনেছিল। তার মধ্যে দুটির কথা তার মনে এল, যেগুলিকে সত্যিই দুর্লভ বলা যায়; একটি নেক্‌টান-এর সাদা ঢিলে কোট আর অন্যটি রাড-এর সোনালী তারযুক্ত বীণা। কিন্তু তার মত এক সামান্য কৃশকায় মেয়ে কিভাবে এসব দুর্লভ বস্তু জোগাড় করবে যাতে এত ক্ষমতাশালী পরীরাও তাকে হিংসা করবে? তারপর তার মনে এল তার বাচ্চার কথা। ওঃ, সে যে সোনা-রুপোর থেকেও দামী! কুসুম আবার শক্ত হল আর দৃঢ়ভাবে কাজে এগোল।

প্রথমে সে এল সমুদ্রের তীরে। সেখানে খাড়াই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নরম পালকের জন্য বিখ্যাত আইডার হাঁসদের বাস। পাথরগুলো জল লেগে লেগে ধারালো হয়ে গেছে। সেই পাথর ধরে উঠে সে খুঁজে ফিরল হাঁসেদের বুক থেকে ঝরে পড়া কোমল সাদা পালকগুলি। কতবার তার পা কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল, সাগরের ঢেউ তার পোষাক বারবার ভিজিয়ে দিল, সে ভ্রুক্ষেপও করল না। সূর্যের তাপে সে ক্লান্ত হল না, বৃষ্টি তাকে দমাতে পারল না। সমুদ্রের ঝড়ও তার কাছে মৃদুভাবে বয়ে গেল। বেদেনীর জাদু তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করছে, এই ভাবনাটা তাকে সাহস দিল।

অবশেষে তার প্রয়োজনীয় হাঁসের পালক জোগাড় হল। এবার কুসুম তা দিয়ে এমন একখানা কোট বানালো যেটা গরম কালের আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের মত নরম আর সাদা। সেই সুন্দর কোটের পাড় ধরে সে নিজের সোনালী লম্বা চুল দিয়ে ফুল, ফল, পাতাভরা নক্সা তৈরী করে দিল। কোটটাকে ফুলগাছের ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখে এবার সে দ্বিতীয় কাজ শুরু করল। সমুদ্রের তীর বরাবর খুঁজে খুঁজে সে জোগাড় করল কতগুলি সামুদ্রিক প্রাণীর হাড়। সূর্যের কড়া রোদে সেগুলির নিজের রং জ্বলে সাদা হয়ে গেছে, সমুদ্রের তীব্র জলোচ্ছ্বাসে তাদের গা হয়ে গেছে মসৃণ। এখন তাদের দেখলে মনে হয়

হাতির দাঁত। নানা কসরৎ করে সেগুলি দিয়ে সে প্রথমে তৈরী করল একটা বীণার কাঠামো। তাতে আবার নিজের সোনালী চুল দিয়ে তার বেঁধে দিল শক্ত করে। এবার সে তাতে এত চমৎকার করে সুর বাঁধল যে সে সুর শুনে আকাশ থেকে পাখিরা নেমে এল, বনের পশু খাওয়া ভুলে মুখ তুলে সুর শুনতে লাগল।

কাঁধে সেই ঢিলে নরম কোট আর হাতে সোনালী তারের বীণা নিয়ে শী পরীদের দেশের দিকে কুসুম রওনা হল। দিনের আলোয়, চাঁদের আলোয় সে পথ চলতে লাগল। খোলা উঁচু রাস্তা, ছায়াঢাকা নিচু পথ পার হয়ে গেল সে; শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছাল লক্ষ্যের দরজায়। সিংহদরজার পাশে লুকিয়ে থেকে সে সমাগত শী-দের খেয়াল করতে লাগল। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তারা সকলেই দেখতে একরকম; ছোটোখাটো চেহারা, কালো চোখ আর চুল, একদম সাধারণ মানুষের মত। শুধু অন্যান্য পরীদের মত তাদেরও কান লম্বা আর ছুঁচলো। আর ওঃ, তাদের চোখগুলো হেলে পড়া আর বাদামের আকারের।

সমস্ত পরীরা দু'তিনজনের ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ঢুকে গেল। কুসুম ভাবছে কি করা যায়; হঠাৎ দেখল একটা মেয়েপরী একা তাড়াতাড়ি আসছে কারণ তার দেরী হয়ে গেছে। কুসুম দেখল এই সুযোগ। সে চট্পট্ কোটটা পরে সেটাকে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিল যে দিনের আলোয় কোটটার সমস্ত শুভ্রতা আর সোনালী সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এইভাবে সে সোজা পরীমেয়েটির সামনে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

বাধা পেয়ে পরী রেগে গিয়ে বলল, "একি, তোমার মত একটা নশ্বর মেয়ে এখানে কি করছে?" তারপর তার চোখ পড়ল সেই কোটটার উপর, যেটা জড়িয়ে মেয়েটিকে লাগছে অপরূপা সৌন্দর্যময়ী। মনে মনে সে তারিফ না করে পারল না। তার হেলে পড়া চোখ লোভে আর ঈর্ষায় চক্চক্ করে উঠল। কোটটা সে তক্ষুনি নিজের করে পেতে চাইল। "এই কোটটার জন্যে কত দাম চাও?" সে জিজ্ঞাসা করল।

কুসুম বলল, "এটা বিক্রির জন্যে নয়।"

"মাটির উপর কোটটা বিছিয়ে দাও, আমি এটাকে সোনার টুকরো দিয়ে ঢেকে দেব। সব তোমার, বদলে কোটটা আমার।"

"পৃথিবীর সব সোনা দিলেও এটি কিনতে পারবে না," কুসুমের দৃঢ়স্বর শোনা গেল, "তবে এটারও একটা দাম আছে।"

"যে দামই হোক না কেন, আমি দেব," পরী বলল। কুসুমের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোটটির নরম ভাঁজগুলি নড়ছিল আর তার থেকে যে দ্যুতি ঠিকরে পড়ছিল তা দেখে পরীর চোখের সীমাহীন লোভ আর বাঁধ মানছিল না।

এবার কুসুম তার আসল কথাটা প্রকাশ করল, "আমি তোমায় এই কোটটা দিতে পারি, যদি তুমি আমাকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

ব্যগ্রভাবে পরী বলল, "তবে ওটা আমায় দাও!"

কুসুম জানতো যে শী-রা প্রতারক হয়। তাই সে বলল, "না, এখনই নয়। আগে তুমি আমায় ভিতরে নিয়ে যাও, তারপর এটা তোমার হবে।" পরীর আর তর সয় না। সে খপ্ করে কুসুমের হাত ধরে

দৌড় দিল। ভালভাবে ভিতরে ঢুকে কুসুম কোটটা তাকে দিয়ে দিল।

ভিতরে ঢুকে কুসুম দেখল সেই সমাবেশের একদম সামনে একটা সিংহাসনের উপর শী-দের নতুন রাজা বসে রয়েছেন। সে পরীদের মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে রাজার সামনে এগোতে চেষ্টা করল। পরীরা তাদের মধ্যে এরকম একজন মানুষকে দেখে এতই হতবাক হয়ে গেছিল যে তারা তাকে কিছুই বলতে পারল না। কুসুম সামনে এসে তার বীণাটা রাজাকে দেখাবার জন্যে তুলে ধরল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতে ওটা কি, মানুষ?"

"একটা বীণা, রাজা," কুসুম উত্তর দিল। "কিন্তু এরকম বীণা আপনার কাছে তো নেই-ই, আগে কেউ চোখেও দেখেনি।" এই বলে সে সেই সোনালী তারে টান দিল। তাতে সেই বীণা থেকে এমন সুন্দর সুর সৃষ্টি হল যে সভায় প্রশংসার এক হিল্লোল বয়ে গেল।

সুর থেমে গেলে রাজা দাঁড়িয়ে উঠে হাত প্রসারিত করে বললেন, "বীণাটা আমায় দাও।"

কুসুম বলল, "কক্ষনো নয়। এই বীণাটা আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি। আমার নিজের সোনালী চুল দিয়ে এর তার বাঁধা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীতে এই জিনিষ আর দ্বিতীয়টি নেই।"

শী রাজা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, "যদিও আমি নিশ্চিত যে এটা তোমার দাবিমত বিস্ময়করও নয় বা অদ্বিতীয়ও নয়, তবু আমার এটা ভাল লেগেছে। তাই কতো দাম চাও বল।"

"মনে হয় এটা আমি বিক্রি করব না।"

রাজা হিসেবে শী-নেতা যে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, সীমাহীন লোভের বশে তিনি সেটাকে পেরিয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, "তোমার যা খুশী চাও, আমি তোমায় সব দেব। কিন্তু বীণাটা আমার চাই।"

কুসুম এখন রাজাকে তার হাতের মধ্যে পেয়ে গেছে। একটুও উত্তেজিত না হয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, "আমার সন্তানকে তোমার শী-পরীরা চুরি করে নিয়ে এসেছে। তাকে ফেরৎ চাই।"

কিন্তু এই দাম দিতে রাজা চান না। তাই তিনি বড় বড় থলি ভর্তি করে সোনা আনতে হুকুম করলেন। সব সোনা কুসুমের পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বললেন, "এগুলি দিয়ে তুমি পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠবে। সব সোনা নিয়ে যাও আর বীণাটা আমায় দাও।"

দৃঢ়ভাবে কিন্তু ধীরে আবার মায়ের জবাব ফিরে এল, "আমি শুধু আমার শিশুকেই ফিরে পেতে চাই।"

এবার রাজা সেই সোনার সঙ্গে আরও মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ এনে দিলেন। তার আলোকের ছটায় যে কোনো মহিলারই হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হবে। কিন্তু কুসুম, আমাদের সন্তানহারা মা, সেসব ফিরেও দেখল না। সে তার দাবিতেই অটল হয়ে রইল।

কোনো কিছুতেই তাকে টলানো গেল না দেখে রাজা শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে আনার হুকুম দিলেন। কিন্তু তাকে তিনি তক্ষুনি মায়ের হাতে দিলেন না। দাবি করলেন, আগে বীণা চাই তবে তিনি শিশুকে ফেরৎ দেবেন। কিন্তু কুসুম তো পরীদের স্বভাব জানে। তাই সে কিছুতেই বীণাটি হাতছাড়া করল না। সে কেবলই বলতে লাগল, "আগে শিশুটিকে নিরাপদে ফেরৎ দিন।"

আর কোনো গত্যন্তর নেই দেখে রাজা শিশুকে মায়ের হাতে তুলে দিলেন, বদলে পেলেন সেই বীণা। এতক্ষণে রাজার মনে শান্তি এল। মনের আনন্দে তিনি বীণাটি বাজাতে লাগলেন। বীণার সুমধুর সুরে

সমস্ত পরীজনতা এত মোহিত হয়ে গেল যে কুসুম কখন তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল, কেউ খেয়ালই করল না।

হয়তো এখনও শী পরীরা সেখানেই আছে, আর সেই সুমধুর সুর শুনছে। সেই সুর কি বলছে জানো? সুর গাইছে এক মায়ের ভালোবাসার কথা, যে তার বাচ্চার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল।

গল্পের উৎসঃ
স্কটল্যান্ডের উপকথা - মে ব্রডলী-র, "ফেয়ারী টেল্‌স্‌ অ্যান্ড লেজেন্ড্‌স্‌ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড"

ভাবানুবাদঃ
শুক্তি দত্ত
কলকাতা

স্বাধীনতার গল্প: ওয়াহাবি-ফরাজী আন্দোলন

এই যে ছোট্ট বন্ধু, কেমন আছ তুমি? গরমে হাঁস-ফাঁস তো? বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে থাকতে আবার ঘুরে গ্রীষ্মকাল ফিরে এল যেন। বৃষ্টি হল যা দু চার ফোঁটা, তাতে শুধু রাত্তির টুকুই ভাল করে ঘুমনো গেল। সকাল হলেই আবার সেই একই রকম ব্যাপার—চটচটে অস্বস্তি। তবে হ্যাঁ, এইতুকুই যা রক্ষা, যে গরমের ছুটিটা বেশ লম্বা হয়ে গেল। আমার বেশ মনে পড়ে, জানো, মামারবাড়িতে ছোটোবেলায় প্রতিবছর গরমকালে যখন থাকতে যেতাম, বাবা-মা এর শাসনের কোনো বাঁধন ছিল না। গ্রামের চাষীদের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতাম। এখন না হয় গরমের দুপুরে রোদ্দুর-এর তেজে বাইরে বেরনোর কথাও ভাবলেই ভয় লাগে, আর তখন খেলার নেশায় সে সব অনুভূতি-ই ছিল না। কত্ত নতুন নতুন অভিযান! নতুন নতুন শেখা! কলাপাতা-কে পানের মত করে মুড়ে তার মধ্যে কাঁচা আম থেঁতো করে নুন, চিনি আর লঙ্কাপোড়া দিয়ে মেখে তার রস ওই কলাপাতার খিলির গোড়া দিয়ে টেনে টেনে খেয়েছ কোনোদিন? পৃথিবীর কোনো রেঁস্তোরা বা আচারের দোকানে এ জিনিস পাবে না! পাকা আম কে 'বেলো' করে খেয়েছ কোনোদিন? বঁটি-ছুরি ছাড়াই একটা আমের ভিতরের শাঁস খোসা না ছাড়িয়েই হাপিস; পড়ে থাকবে শুধু খোসা আর আঁটি।– খেয়েছ কোনদিন? মহাত্মা গান্ধির খুব প্রিয় খাবারের মধ্যে একটা ছিল এই বেলো করা আম। মহাত্মা গান্ধির কথাটা বললাম কেন জান? না হলে তোমার বাড়ির বড়রা আবার ভাববেন কি সব বদ গেঁয়ো শিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে! যাই হোক তবু আমার ছেলেবেলার আনন্দ-টা শুনেও তো তুমি কিছুটা আনন্দ পাবে, আর আমার তাতেই বেশি আনন্দ। তবে ওই সব বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম, যা কোনো স্কুলে শেখা যায় না। একদম মাটির শিক্ষা, হাতে নাতে শিক্ষা, ধৈর্যের শিক্ষা, অনেক কিছু ছাড়াই খুশিতে বাঁচার শিক্ষা, একজোট হয়ে কাজের শিক্ষা, সব রকম মানুষ-কে সম্মানের শিক্ষা – যা সিলেবাসের বাইরে। শেখার মূল মন্ত্রটা তোমার কানে কানে বলে দিই আজ – তোমার সঙ্গে যিনিই থাকুন না কেন, যদি তাঁর কাছ থেকে শেখার কিছু থাকে, তাহলে তাঁর বয়েস আর শ্রেনী বিচার না করে বরং তাঁর জানা আর তোমার অজানাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিও। ব্যাস। দেখবে, কাম খতম। আধুনিকতার মায়াজালে এক আশির্বাদ দুর্ভিক্ষ সে ভাবে না হওয়া। তবে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা তথা

পুরো উত্তর ভারতে প্রতি দশকে গড়ে একবার করে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কারণ – বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের আগ্রাসী অপশাসন, বাণিজ্যের নামে দুর্ণীতি ও জুলুমবাজি, মুঘল আমলের চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণশ খাজনা আদায়, বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়।তার মধ্যে আবার গোদের অপর বিষফোঁড়া, লর্ড কর্নওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'।

আচ্ছা তুমিই বল এরকম অবস্থায় কোন গরীব সাধারন মানুষটা আর স্বাভাবিক থাকতে পারে।কৃষ্কদের মনে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটল ওয়াহাবি বিদ্রোহের মাধ্যমে। ফরাজী তার অনুসারী হয়।

বৃটিশ শক্তি তখন প্রায় সারা ভারতেই প্রসারিত। শেষ ভরসা টিপু সুলতান পরাজিত হয়ে বীরের মত ইংরেজদের হাতে নিহত হয়েছেন।মারাঠা শক্তি তখনো জ্বলছে তুষের আগুনের মত।দাবানল হওয়ার শক্তি তার আর নেই।শুধু রণজিত সিংহ তখনও পাঞ্জাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঠিক সেই সময়ে হোলকারের এক প্রাক্তন সেনাপতি সৈয়দ আহমেদ বারলেচী-র (১৭৮৬-১৮৩১) আবির্ভাব হয়।। তিনি ভারতের সকল মুসলিমদের ওয়াহাবি আন্দোলনের ডাক দেন। ওয়াহাবি শব্দের মানে জান? এর অর্থ হল 'নবজাগরণ'। তাঁর আহ্বান ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। এটা ত' সত্যি কথা যে ওয়াহাবি আন্দোলনে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ছিল। তবে নিঃস্ব রিক্ত কৃষকদের মধ্যে এবং বেশ ভালভাবেই জনসাধারনের মধ্যে এই আন্দোলন বিপুল সাড়া জাগায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় যে জমিদার শ্রেনির উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল হিন্দু। আর বাংলার অধিকাংশ কৃষকই ছিল মুসলমান।সাম্প্রদায়িকতার ছাপ স্পষ্ট হলেও যেহেতু ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠিত হয়, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।কেন জান? দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধা জাত-ধর্ম বিছার করে আসে না। কৃষক সমাজে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল। বৃটিশদের সৃষ্ট 'মারী মন্বন্তরে' যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ওয়াহাবির ডাক তাই তখন মুসলিমদের খুবই বেশি করে উদবুদ্ধ করেছিল।সাপ্রদায়িক আন্দোলন হওয়া সত্বেও হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ও বিবাদ এর মধ্য এক্কেবারেই ছিল না।বরং সবাই একজোটে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল সব জমিদার, জোতদার ও তাদের পরম পৃষ্ঠপোষক বৃটিশদের বিরুদ্ধে।

বাংলায় ওয়াহাবিদের নেতা ছিলেন মৌলবী শরিয়তুল্লাহ। সৈয়দ আহমেদ বাংলায় এসে ওয়াহাবির আদর্শ প্রচার করেন। মক্কায় বহুদিন থাকার পর দেশে ফিরে তিনি ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্যে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচার করেন।তাঁর সংস্কার ছিল পরশাসন ও শোষণ বিরোধী।পরশাসনের ছাতার নিচে থাকা সমস্ত সমর্থক, জোতদার, জমিদার, সামন্ত, গোমস্তা, তহশিলদারেরা শ্বাভাবিকভাবেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

শরিয়তুল্লাহ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী গোপন সংগঠন 'ফরাজী' সম্প্রদায় গঠন করেন।বাংলায় ফরাজীরাই হল ওয়াহাবি আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক। ফরাজীরাই হল তার সদস্য ও যোদ্ধা। তাদের মূল শত্রু হল ইংরেজ এবং তাদের শাসন ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেনী।কিন্তু দুঃখের কথা কি জান, এই আন্দোলন ভালোভাবে সংগঠিত হওার আগেই শরিয়তুল্লার মৃত্যু হয়। তাঁর যোগ্য পুত্র দুদু মিঞা বাংলায় ওয়াহাবি-ফরাজী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগ দেয়।

শ্বেতাঙ্গ নীলকরেরাও কম ছিল না অত্যাচারের দিক থেকে। বাংলার শিক্ষিত শ্রেনী নীল্কর সাহেব্দের অত্যাচারে প্রতিবাদ শুরু করারা আগেই দুদুমিঞা-নেতৃত্বে ওয়াহাবিরা নীলকুঠির ওপর অত্যাচার চালায়। সাহিত্য যে সমকালীন সমাজের ঐতিহাসিক দর্পন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক 'নীলদর্পন'। হরিশচন্দ্র মুখার্জীর তত্বাবধানে প্রকাশিত হিন্দু পত্রিকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয়। অনেক ব্রিটিশ সাহেবও কিন্তু ছিলেন যাঁরা এই দেশকে ভালবাসতেন। রেভারেন্ড জেমস লং এর কথা এই প্রসঙ্গে তমাদের না বললেই নয়।'নীলদর্পণ' ইংরেজি-তে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর তা হরিশচন্দ্র তা তাঁর পত্রিকার প্রকাশ করেন জেমস লং এর সহায়তায়। ফলে লং সাহেবের এক মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তক্ষুনি সেই টাকা আদালতে জমা দেন।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণার অনেক আগেই ওয়াহাবিরা কৃষকদের একভাবে সংগঠিত কর ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।বাংলার বহু জায়গায় তারা মুক্তাঞ্চল গড়তে পেরেছিল। কিন্তু দুদুমিঞা ছাড়া এই আন্দোলনে দ্বিতীয় আর কোনো নেতা না থাকায় তার গতি ও তেজ বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি।সুসংগঠিত বিরোধীদের প্রতিআক্রমনে তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন হারিয়ে যায়। তবে সিপাহী বিদ্রোহের সম্য পর্যন্ত ওয়াহাবিদের আন্দোলন ও ইংরেজ শাসন নির্মূল করার সংগঠিত চেষ্টা বেশ সক্রিয় ছিল।

ওরে বাবা!!! অনেকটা লিখে ফেললাম যে!!! তুমি আবার যেন রাগ কোরো না বাপু!আর এটা তো গল্প, পড়া তো আর নয়! তাই না!

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্প

সত্যজিৎ রায় নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে বলেছেন যে চলচ্চিত্র যদিবা তাঁর কাছে দূরের জিনিষ হয়, সাহিত্য তাঁর রক্তেই আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর, জনক সুকুমার, পিসিমা লীলা মজুমদার বা সুখলতা রাও-দের হাত ধরেই সাহিত্য এসে সত্যজিতের মনের দরজায় কড়া নাড়ে। এখানেও একটি বিচিত্র গতিপথ খেয়াল করা যায়। উপেন্দ্রকিশোর সত্যিকারের ছোটদের কথা ভেবেছিলেন, যে কারণে লিখেছিলেন 'টুনটুনির বই' ; সুকুমার ভেবেছিলেন বালকদের কথা, পাগলা দাশুদের কথা, আর সত্যজিৎ ভাবলেন বয়ঃসন্ধির কিশোরদের কথা। যুগ পালটে গেছে। দেশে স্বাধীন হয়েছে। কলকারখানা শহর বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সত্যজিত অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে গোয়েন্দা গল্পেরও চর্চা করলেন। আর সেই গল্প ছবিতেও এল।

সত্যজিৎ -এর গোয়েন্দা গল্প স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত। পুরুষের জগৎ। কিন্তু নানাভাবে বোঝা যায় দৃশ্যের সৌন্দর্য অপরাধকেও ছেড়ে যায় না। এই গোয়েন্দাগল্পগুলিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায় যে যিনি লিখছেন তাঁর চোখ আছে। জায়গার কি নিপুণ বর্ণনা, সে দার্জিলিং- গ্যাংটকই হোক, বা কাশী কিংবা জয়শলমীরই হোক। টুরিস্ট ব্যুরোর বইকে আমরা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু সত্যজিতের আঁচড়ে যে রাজস্থান, তাকে পাত্তা না দেওয়ার যো নেই। ছোটরা আর তাদের বাবা মায়েরা মেনেও নিয়েছেন সে কথা। যে কারণে 'সোনার কেল্লা' আর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এত জনপ্রিয়।

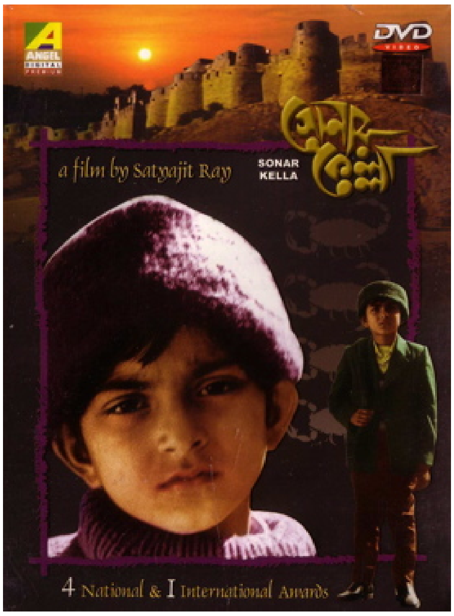

সোনার কেল্লা ছবির পোস্টার

আসলে সত্যজিৎ রায় গল্পটাই যে অন্য ভাবে বলেন। খুব যে তদন্ত আছে তা নয়, বরং আমরা খেয়াল করি ফেলুদা ও তোপসের দিকে তাঁর ঝোঁক অনেক বেশি। মগনলাল মেঘরাজ আর সোনার কেল্লার দুষ্টু লোকেদের খুঁজে বের করার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম করে না ফেলুদা। শুধু ব্যবহার করে 'মগজাস্ত্র'। আর অসাধারণ হয়ে আমাদের কাছে জেগে থাকেন আরেকজন - জটায়ু সন্তোষ দত্ত। কি দারুণ লাগে জটায়ু যখন ময়ূর দেখে ন্যাশ্‌নাল বার্ড বলেন, বা যখন তাঁকে ব্যায়াম করতে দেখি 'জয় বাবা ফেলুনাথ' -এ। ছোটদের জানান না দিয়েই জটায়ু হয়ে ওঠেন বাংলার গোয়েন্দা গল্পের এক জীবন্ত সমালোচনা।'সাহারায় সীতাহরণ' তো তাঁরই লেখা!

জয় বাবা ফেলুনাথ- এর পোস্টার

আমরা যে এত খুশি হই তার কারণ এইসব গল্পে খুব হাড় হিম করা মারামারি নেই। বুনোট তেমন প্যাঁচালো নয়।কিন্তু কি সুন্দরভাবে সত্যজিতের সাথে ট্রেনে, বা গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে, 'সোনার কেল্লা' দেখতে দেখতে আমাদের রাজপুতানা বেড়ানো হয়ে যায়। উটের পিঠে চড়ার মজা, উটের দৌড় আর ট্রেনের দৌড়, বারানসীর গঙ্গার ঘাট বা ছোরা খেলা, সবই আমরা দেখে ফেলি ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে। আর কিছু তো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নেই। সত্যজিৎ রায়ের কোন ভানই নেই যে তিনি সবার আগে পৌঁছে অপরাধী খুঁজে দেবেন। আমরা অনেক সময়ে প্রথম থেকেই জানি কোন লোকটা খারাপ। তবু গল্পটা এত ভাল যে আমরা গল্পেই মজে থাকি। এ প্রায় আলফ্রেড হিচ্‌ককের ছবির মত, যেখানে খোঁজাটা ওজনদার, বরং দেখাতেই আনন্দ। সত্যজিৎ রায়, একমাত্র সত্যজিৎ রায়ই আমাদের বারো-তেরো বছরের দুঃখটা বুঝেছিলেন --- যে আমরা একটা গল্প শুনতে বা দেখতে চাই, সে আমাদের সাথে বাবা মা থাকুন আর নাই থাকুন...গল্পটা আমাদের যেন বড় ভাবে!

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবির খবর: মুক্তধারা

একটা জেলখানা। তার বিরাট উঁচু পাঁচিল, তালা লাগানো বড় বড় লোহার দরজা, ছোট্টছোট্ট কুঠুরি, সেখানে সূর্যের আলো প্রায় ঢোকেই না; আর সেই সব কুঠুরিতে বন্দী থাকে তারা, যারা কোন না কোন খারাপ কাজ করেছে। তাদের অন্যায়ের বিচার হয়েছে, আর বিচারের সাজা হয়েছে জেলখানায় বন্দী জীবন কাটানো। কারোর কয়েক মাস, কারোর অনেক বছর, কারোর বা সারা জীবন। সেখানে এই সব মানুষকে নানারকমের হাতের কাজ ও অন্যান্য কাজ করতে সেখানো হয়, পড়াশোনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যাতে সাজার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তারা জেলের বাইরে এসে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত সৎ পথে উপার্জন করতে পারে। এই কারণেই জেলখানার নতুন নাম সংশোধনাগার।

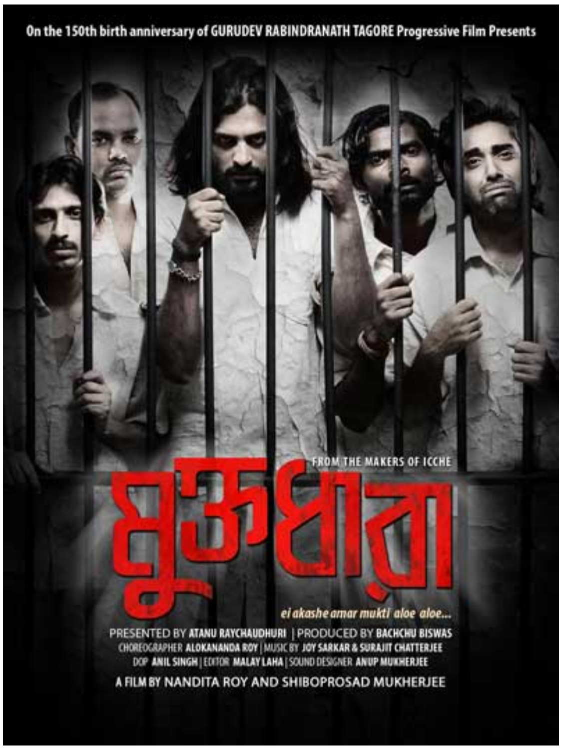

কিন্তু সংশোধন করতে চাইলেই তো আর সবাই বদলে যেতে চায় না। তাই আমাদের গল্পের এই জেলখানায়ও আছে এমন কিছু কয়েদী, যারা জেলের ভেতরেও খুব ভয়ঙ্কর। তারা অন্য কয়েদীদের

ওপর অত্যাচার করে, জেলের মধ্যে থেকেও নানা রকমের খারাপ কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর কয়েদী হল ইউসুফ মহম্মদ। সে প্রচুর নিরপরাধ মানুষকে মেরেছে। সে কাউকে পরোয়া করে না। সবাই তাকে ভয় পায়, সমঝে চলে। এই অবস্থায় রাজ্যের কারা বিভাগের নতুন ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়ে এলেন বৃজভূষণ দত্ত। কয়েদীদের মানসিক উন্নতি করানোর ব্যাপারে তাঁর নানা ধরণের পরিকল্পনা। তাঁর সাথে একদিন আলাপ হল নীহারিকা চ্যাটার্জির। নীহারিকা একজন নৃত্যশিল্পী, কিন্তু তিনি পেশাদার নন।মূক-বধির ছোট্ট মেয়ে স্পৃহাকে নিয়েই সময় কাটে তাঁর। আই. জি. দত্ত নীহারিকাকে বললেন সংশোধনাগারে এসে কয়েদীদের নাচ শেখাতে।তাঁর মতে, এই ধরণের 'কালচার থেরাপি', অর্থাৎ সুস্থ-সুন্দর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাতে পারলে অনেক কয়েদীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব। প্রথমে রাজি না হলেও, পরে তাঁর কথায় সংশোধনাগারে যেতে রাজি হলেন নীহারিকা।

কিন্তু শেখাতে গেলেই তো আর হল না। বাছাই করা কয়েদীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, তার ওপরে আবার পুরুষ, তাই তারা কিছুতেই নাচ শিখতে রাজি হল না। নীহারিকা তাদেরকে জোর করলেন না। তাদের সাথে প্রথমে তিনি বন্ধুত্ব পাতালেন। একটু একটু করে তারা সহজ হল, নানারকমের শারিরীক কসরত শিখতে শুরু করল। এইভাবে ক্লাস নিতে নিতেই নীহারিকা একদিন ঠিক করলেন, তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মিকী প্রতিভা" নৃত্যনাট্য করাবেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'র গল্প জান নিশ্চই। পুরাণের সেই গল্প, যেখানে দস্যু রত্নাকর, মা সরস্বতীর কৃপায় হয়ে ওঠেন কবি আর রচনা করেন 'রামায়ণ'; আর সেই নৃত্যনাট্যে বাল্মিকীর চরিত্রে অভিনয় করবে আর কেউ নয়, ইউসুফ মহম্মদ।

ইউসুফকে কোনমতে রাজি করানো গেল। কিন্তু সে মনে মনে অন্য মতলব আঁটলো। সে ঠিক করল কয়েকজন সঙ্গী সাথীকে নিয়ে সে অনুষ্ঠান চলতে চলতে সন্ধ্যের অন্ধকারে পালিয়ে যাবে। সেইমত সে তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের তলার সুড়ঙ্গের পথও খুঁজে ফেলল। আর অনুষ্ঠানের সন্ধ্যেবেলায়, যখন নৃত্যনাট্য চলছে, তখন এক সময়ে তারা পাঁচজনে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পালিয়েও গেল!

এর পরে কি হবে? নৃত্যনাট্য কি মাঝপথে থেমে যাবে? যারা বৃজভূষণ দত্ত আর নীহারিকার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, এইসব আসামীদের মধ্যে কখনই বদল আনা যাবে না, তাদের কথাই কি শেষ পর্যন্ত সত্যি হবে? হেরে যাবেন আই. জি. আর নীহারিকা? সেটা জানতে হলে শেষ অবধি দেখতে হবে পরিচালক যুগল নন্দিতা রায় আর শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'মুক্তধারা'।

তুমি হয়ত ভাবছ, 'মুক্তধারা' যে ছোটদের জন্য তৈরি করা ছবি, এমন তো শুনিনি...

ঠিক, তা হয়ত শোননি, কিন্তু 'মুক্তধারা' বড়দের সাথে সাথে ছোটদেরও দেখার আর ভাললাগার মত একটা খুব ভাল ছবি। আর এই ছবির অবাক করা ব্যাপারটা কি জান, এটা কিন্তু বানানো গল্প নয়। এই ছবির গল্প কিন্তু আসলে একদম সত্যি ঘটনা। নীহারিকা চ্যাটার্জির চরিত্রটা তৈরি হয়েছে বাংলার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি অলকানন্দা রায়ের আদলে। অলকানন্দা সত্যিই কলকাতার এক সংশোধনাগারে গিয়ে সেখানকার বন্দীদের সাথে নাচের ওয়ার্কশপ করেন এবং তাদের সাথে নিয়ে, সংশোধনাগারের বাইরে পেশাদারী মঞ্চে এসে 'বাল্মিকী প্রতিভা' অনুষ্ঠিত করান। আর এই ছবির বিস্ময় হলেন ইউসুফ মহম্মদের চরিত্রের অভিনেতা নাইজেল আকারা। নাইজেল কিন্তু একজন সত্যি অপরাধী, এবং তিনি নানারকমের অপরাধের সাজা পেয়ে সংশোধনাগারে বন্দী ছিলেন। অলকানন্দা রায়ের সংস্পর্শে এসে তিনি এক সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হন। তিনি এখন সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন, সৎপথে উপার্জন করছেন, আর এই ছবিতেও অভিনয় করেছেন। সঠিক সুযোগ দিলে কোন তথাকথিত খারাপ মানুষও যে ভাল হয়ে উঠতে পারে, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাইজেল আকারা।

আর এই ছবির আরেকজন বিশেষ শিল্পী হল ছোট্ট মেয়ে সুচিত্রা চক্রবর্তী। স্পৃহার ভূমিকায় কলকাতা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের এই ছাত্রী অভিনয় করেছে।

'...এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...' রবি ঠাকুরের গানের এই পংক্তি 'মুক্তধারা' ছবির ট্যাগলাইন। মুক্তধারা দেয় সেই মুক্তির আস্বাদ। সেই মুক্তি কিন্তু কারাগার ভাঙার মুক্তি নয়, সেই মুক্তি হল মনের মুক্তি, চেতনার মুক্তি...

এই ছুটিতে, যোগাড় করে ফেল মুক্তধারার ডিভিডি। আর ঠাকুর দেখার ফাঁকে সময় করে দেখে ফেল মন ভাল করে দেওয়া এই ছবি।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

ছবিঃ মুক্তধারা ওয়েবসাইট

<u>দেশে-বিদেশে</u>

দেবভূমি উত্তরাখন্ড (২)

প্রতিবার ভাবি এ কিসের টান? এ কিসের মায়া? কেন এই অমোঘ হাতছানি পাহাড়ের? কিসের ইন্দ্রজালে বশ করেছে পাহাড় আমাদের? আমরা জ্ঞানপাপীর মত বুঝি সেই অমোঘ আকর্ষণের কথা। জানি সেই পথশ্রম কি ভয়ঙ্কর। তবুও নিশির ডাকের মত ছুটে চলি সেই সর্বনাশিনী পথমায়ায়।একবার হাসি পাহাড়ি বনফুলের যৌবনগন্ধ নিতে নিতে আবার কেঁদে ফেলি পথের দুর্গমতা দেখে।
ভোর ভোর গুপ্তকাশী থেকে তুঙ্গনাথের পথে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকটা দুর্গম পথ পথ গাড়িতে যেতে হবে। তারপর শুরু হবে পায়ে হাঁটা দুর্গমতর পথ। সাতপাঁচ ভাবি আবার মনে ভয় মিশ্রিত আনন্দও উঁকি দেয়।

পথ চলা শুরু হল বেশ আনন্দের সঙ্গে। চোপতায় থামা তারপর হাঁটার শুরু। চোপতা থেকে ৩৫০০ ফুট উঠতে হবে চড়াই পথ বেয়ে!

তুঙ্গনাথের পথ

পাথরের বাঁধানো ধাপকাটা পথ কিন্তু শুরু থেকেই চড়াই। কেদারনাথে পথ খুব বিপদ সঙ্কুল যার একপাশে খাদ আর অন্যদিকে পাহাড়ের গা। কিন্তু শুরু থেকে শেষ অবধি অতটা চড়াই নয়। তুঙ্গনাথের পথ শুরু থেকেই চড়াই ফলে কিছুদূর গিয়েই মনে হয় আর পারবনা পৌঁছতে, দম ফুরিয়ে যায়। অক্সিজেন কম পড়ছে বোধ হয়। ফুসফুস আর টানতে পারছেনা। যেমন করেই হোক আমাকে পৌঁছতে হবেই। পৃথ্বীশ আমার কষ্ট দেখলেই বলছে বসে নাও, জিরিয়ে নাও। তাড়ার তো কিছু নেই। ছোট ছোট স্টেপ ফেল। মরুতীর্থ হিংলাজ সিনেমার সেই দৃশ্য ভাসছে চোখের সামনে "পথের ক্লান্তি ভুলে..."

বল গো ঠাকুর কবে তোমার দেখা পাব?

একটু জল খাচ্ছি আবার হাঁটছি। দূর থেকে তুঙ্গনাথের মন্দিরের বিশাল ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। বুঝলাম কাছাকাছি এসে পড়েছি। মনের জোরে শেষমেশ পৌঁছলাম তুঙ্গনাথ ১২৫০০ ফুট উচ্চতায়। বেশ হাড় কাঁপানো ঠান্ডা ওপরে। মেঘলা আকাশ। রোদের প্রখরতা একেবারে নেই। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরল গায়ে। তবে ওপরে পৌঁছে মন্দিরের বিশাল হলুদ ধ্বজা দেখতে পেয়ে মনে বড় আনন্দ হল। at last the goal is achieved! মন্দিরচত্বরে যত্রতত্র তুষারপাত হয়েছে। দর্শন দিলেন তুঙ্গনাথ স্বয়ং।

তুঙ্গনাথ

তুঙ্গনাথ থেকে নীচে নেমে এসে চোপতায় এসে দুপুরের খাবার সারলাম আগুণ গরম টোম্যাটো স্যুপ আর ভেজ-ম্যাগি দিয়ে। সেই মূহূর্তে গরম খাবারের খুব প্রয়োজন ছিল। অনেকটা ক্লান্তি লাঘব হল। গাড়িতে ফিরে এসে আবার পথ চলা। এবারের গন্তব্যস্থল উখীমঠ। উখীমঠ রুদ্রপ্রয়াগ থেকে মাত্র ৪১ কিমি দূরে। পাহাড়ের ওপর ১৩১১ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট শহর। উখীমঠের সংস্কৃত নাম ঊষামঠ। পুরাকালে বানাসুরের রাজধানী ছিল এটি।

দীপাবলীর পর যখন কেদারনাথ মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তখন বিগ্রহ নিয়ে স্বয়ং পুরোহিত মশাই বা রাওয়াল উখীমঠে এসে আশ্রয় নেন ছ'মাসের জন্য। দেখলাম সেই মন্দির আর পুরোহিতের থাকবার

আশ্রম। পাহাড়ের ওপর থেকে একফালি নীলচে রংয়ের মন্দাকিনী চোখে পড়ে যার একপাশে গুপ্তকাশী আর অন্যপাশে উখীমঠ। খুব শান্ত নিসর্গ। সূর্যাস্তের কাছাকাছি আমরা তখন। তুঙ্গনাথের পথশ্রমের ক্লান্তি ভুলে এখানে এসে বসে একটু জিরেন হল। কাছেই আছে দেওরিয়া তাল বা লেকটি।

উখীমঠ

এবার হোটেলে ফিরে এসে মুখ হাত-পা ধুয়ে গরম চা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে লিখতে বসে গেলাম আমার রোজনামচা। মনে একটু খচখচানি এই যে হরিদ্বারের পর আর নেট কানেকশান পাওয়া গেলনা বলে। যাইহোক রাতের খাওয়া সেরে নিলাম যথারীতি গরম রুটি, ডাল আর সবজি দিয়ে।
পরদিন ভোরে চা-জলখাবার, স্নান সেরে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া উত্তরকাশীর উদ্দেশ্যে। এইটি হোল সবচেয়ে দীর্ঘতম জার্ণি। সকাল ৭টায় যাত্রা শুরু হল গুপ্তকাশী থেকে। একে একে পেরোলো ভিরী, তিলওয়াড়া। তেহরী বাইপাস করে ঘনশালী। পথে পড়ল লাস্তার নদী। সূর্যপ্রয়াগে লাস্তার নদী মিলিত হয়েছে মন্দাকিনীর সাথে। এখানে সকলে সূর্যের তর্পণ করতে আসে।

কবীরের দোঁহায় বলে " পাথর পূজে হর মিলে ম্যায় পূজে পাহাড় তাতে ওয়াচাকে বলি ইস খায় সংসার "

ঘনশালী বাজার এল বেলা বারোটা নাগাদ। ধনতেরস আর দীপাবলীর বাজার রমরমিয়ে চলছে। সেদিন ছিল ভূতচতুর্দশী। রংচং দিয়ে নানারকম মিষ্টি, শুকনো ফল আর আতসবাজির মহা পসরা। ভীলগঙ্গার ওপর ছোট্ট সেতু পেরোলাম। তারপর বালগঙ্গা। চানিয়ালি, প্রেমনগর সিলওয়াড়া হয়ে তেহরী। কেমুন্ডা খাল পেরোলাম। সেখান থেকে উত্তরকাশী আরো ৬৩ কিলোমিটার। বিকেল তিনটেয় পৌঁছলাম উত্তরকাশী। ভাগিরথীর তীরে বারাণসীর মত পুরোণো, ঘিঞ্জি শহর কিন্তু নদীর এতই কাছে যে হোটেলে ঢুকে নদীর নীল জল দেখতে পেয়ে মনে হল, আপাততঃ অলিগলি, ঘিঞ্জি, কোলাহল, বাজার এই কয়েকটা শব্দ না হয় বাদ থাক আমার অভিধান থেকে। এতগুলো শহরের মধ্যে উত্তরকাশীতে এসে আবার কোন এক ভালোলাগায় আবিষ্ট হলাম। সাদামাটা হোটেল কিন্তু খাটে শুয়ে হিমালয় আর তার কোল জুড়ে ভাগিরথীর নীল জল আর সাদা ফেনিল জলরাশির কুলকুচি।

নীল ভাগিরথী সাদা ঘাগরার কুঁচি লুটিয়ে নেচে নেচে চলেছে উত্তরকাশীর এমাথা থেকে ওমাথা। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে কত পুরোণো মন্দির আর সাধুবাবাদের আশ্রম। ঠিক যেন পুরোণো কাশীবিশ্বনাথের বেনারস। সেখানেও গঙ্গার ধার দিয়ে অসংখ্য মন্দির আর আশ্রম। উত্তরকাশীতে একবার তেত্রিশকোটি দেবদেবীদের ভেট হয়েছিল বিশ্বনাথ মন্দিরে। তার কারণ হল দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধ যখন শেষ হচ্ছিলনা তখন মাদুর্গা এখানে একটি বিশালাকায় ত্রিশূল প্রোথিত করে এই দেবভূমির ঘাঁটি আগলে ছিলেন। এই হল উত্তরকাশী। সেই শক্তিমাতার ত্রিশূল এখনো অক্ষত। তাকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে হেলানো যায় কিন্তু হাতে করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিন্দুমাত্র নাড়ানো যায়না। মহাদেব নাকি এই বিশাল অষ্টধাতুর ত্রিশূল দিয়ে বকাসুর বধ করেছিলেন।

মা-দূর্গার ত্রিশূল

মহাদেব মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে পরশুরাম, লর্ড একাদশ রুদ্র এবং কালীর মন্দির। ভাগিরথীর তীরে রয়েছে অগণিত আশ্রম ও ঘাট। ভাগিরথীর জলের তখন পড়েছে সূর্যাস্তের রং। ভূত চতুর্দশী তিথি সেদিন। কিছু পরেই নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঢেকে যাবে নদীর তীর। সাধুবাবারা গঞ্জিকা সেবনের তোড়জোড় করছেন তখন। মন্দিরে বাজছে সন্ধ্যারতির ঘন্টা। আমি যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম নদীর দিকে। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে ভাগিরথী আপনমনে। এই জায়গাটিতে গেলাম। নদীর ধারে বড়ই মনোরম স্থান। আর মন্দিরের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে পড়বে এক একটি ঘাট। আমরা কেদারঘাটে গেলাম ও জলে পা ডোবালাম। এটি একটি শ্মশান ও বটে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদীর শব্দ মিলে মিশে একাকার এখানে। ঘাট থেকে আমাদের কালীঘাটের মন্দিরের মত সরুগলি দিয়ে দিয়ে বাজারে এলাম। ধনতেরসে ধাতুজ দ্রব্য কেনে আধুনিক ভারতবর্ষের সকল মানুষ। বাঙালীদের মধ্যেও অবাঙালি এই প্রথা চালু হয়ে গেছে। তাই আমিও

ব্যাতিক্রমী হলাম না। দেবভূমির এই পবিত্র স্থানে পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর তীরে এক বাসনের দোকান থেকে কিনে ফেললাম পছন্দের তামার দ্রব্যাদি। রকমারী ঘটি আর কমন্ডলু। আমার ধনতেরসের লক্ষ্মী আগমনী হোল। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ছমছমে অন্ধকার তখন। আমার মাথায় ঝিমঝিম করছে হিমালয়ের নেশা। আর হিমালয়ের মাথার নীচে জোনাকীর মত আলোর বসতি ফুটফুট করে জ্বলছে। থিকথিকে সেই আলোর বাসা। উত্তরকাশীর অলিগলি, উত্তরকাশীর ব্যস্ত শহরতলী। মোম কিনে এনে হোটেলের ঘরে এসে চৌদ্দপ্রদীপের নেমকম্ম সমাধা করলাম। কি সুন্দর একটা শহর। কাশী বেনারসের গন্ধ রয়েছে যেন। অথচ আরেকটু যেন ছিমছাম।

জটাজুটসমাযুক্তাং নগাধিরাজ হিমালয় আর তার থেকে নেমে এসেছে অগণিত স্রোতস্বিনী। দেবাদিদেব মহাদেবের আনন্দধারা গড়িয়ে পড়েছে সেই স্রোতস্বিনীর কমন্ডলু থেকে। হরের দুয়ারে কিম্বা হরির দ্বারে। যেখানেই হোক আমার চোখ সার্থক করেছে দেবভূমির আকাশের নীলরং, কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত! বাতাসে বরফগলা পুণ্যতোয়া নদীদের কলকলানি এখনো লেগে রয়ে গেল দুকানে। কিসের জন্য এই কৃচ্ছসাধন? কেন রসাতল সমতলী জীবনযাপন, দীপাবলীর ভোগবিলাস? শুধুই কি আত্মতৃপ্তি না কি দেবলোকে দার্শনিক হবার লোভ সংবরণ করতে না পারা? অফুরান জীবনের পথের ধারে রেখে এলাম সেই নুড়িপাথরগুলোকে। হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম ভালোলাগার রেশটুকুনি। পাহাড়চূড়োর কত না জানা কথাকাহিনীরা তখন ভীড় করেছে আমার মাথায়।
কাছেই দেখি মহানগরের সেই ভীড় রাজপথ।

লেখা ও ছবিঃ
ইন্দিরা মুখার্জি
কলকাতা

মজার শহর নিউ অর্লিন্স

কাঁচের জানলায় মাথাটা ঠুকে যেতে ঝিমুনিটা কেটে গেল। ভোর সাড়ে তিনটে। এসি-টা বেশ ঠাণ্ডা। কানের পাশে একটানা শাঁ -শাঁ শব্দ আর হাল্কা ঘুমপাড়ানি ঝাঁকুনি। বাসের সিটে আধশোয়া হয়েই বেশ একরাউণ্ড ঘুম দেওয়া হয়ে গেল। বাসের মধ্যে এখনো অন্ধকার। কোমরটাকে একটু সোজা করে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম কাঁচের ওপারে কিছু চোখে পড়ে কিনা। মনে হল বিশাল বিশাল পিলারের মতন কিছু যেন হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। আবছায়ার মধ্যে দূরে জ্বলছে সারি সারি আলোর মালা। চোখ কচলে ভালো করে দেখে বুঝলাম - আমাদের বাস চলেছে একটা বড় ব্রিজের ওপর দিয়ে। নিচে বইছে বিস্তীর্ণ কালো জলরাশি। ঐ আলোর মালা তারই দূরবর্তী তটরেখা। বুঝলাম, আমরা এইমুহূর্তে রয়েছি 'যাযাবর' গায়কের সেই বিখ্যাত নদ মিসিসিপির ওপরে - "আমি গঙ্গার সাথে মিসিসিপি হয়ে ভোলগার রূপ দেখেছি "! আমাদের গন্তব্য নিউ অর্লিন্স, লুইসিয়ানা ষ্টেটের এক নম্বর ট্যুরিষ্ট আকর্ষণ!

মার্কিন মুলুকে পা রেখেছি বছরতিনেক আগে। কিন্তু টেক্সাস ছেড়ে বেরোই নি একবারও। পি এইচ ডি-র ছাত্রের পকেট এবং সময় দুয়েরই ভারি টানাটানি। শেষে এই ২০১২-র মে মাসে স্প্রিং সেমিস্টার শেষ হতে আমার সহধর্মিণী রূপসীর প্রবল তাড়নায় ব্যাকপ্যাকিং! দিনদুয়েকের মধ্যে শ-খানেক ব্লগ, ট্রাভেল ওয়েবসাইট, ইউটিউব ভিডিও আর অবশ্যই গুগল ম্যাপ ঘেঁটে দুজনে স্থির করলাম, এবার নিউ অর্লিন্স শহরে দুই রাত্রিবাস। যাবার দ্রুত ও সহজতম উপায় অবশ্যই বিমানে, কিন্তু সে অনেক ডলারের ধাক্কা! তাই আমাদের ভ্রমণ একেবারে ডাউন-টু-আর্থ - আমেরিকার সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ইন্টার-ষ্টেট বাস সার্ভিস - গ্রে হাউণ্ড-এ সওয়ার হয়ে। হিউষ্টনে বাসে চেপেছি রাত্রে, পৌঁছাব পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ। তবে আমেরিকার হাজার হাজার মাইলব্যাপী ফ্রি-ওয়ে বিশ্বসেরা, তাই এক রাত্রি বাসে কাটিয়েও পায়ে একটু ঝিনঝিন ধরা ছাড়া আর কোনো জার্নির ধকল নেই।

ভোরে ঘুম ভেঙেই মিসিসিপি দর্শনে বেশ একটা 'বেড়াতে যাচ্ছি' 'বেড়াতে যাচ্ছি' ফিলিং হল। রূপসী-ও জেগে উঠে মিসিসিপির বিশালতা দেখে মুগ্ধ। দুধারের জলাভূমি আর জঙ্গল ভেদ করে আমরা চলেছি কংক্রিটের সড়ক ধরে। ভোরের প্রথম আলো ফুটছে - অনেক দিন পর দেখলাম সূর্য ওঠা!

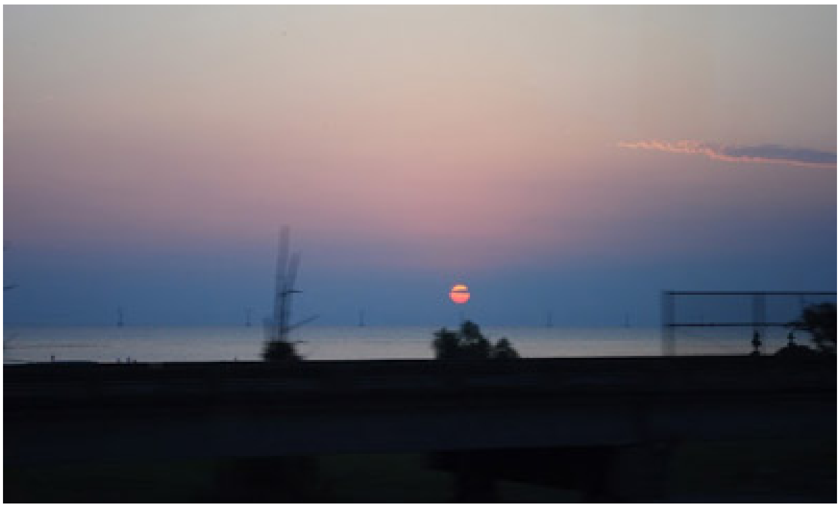

এইবেলা নিউ অর্লিন্স শহরের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা জানিয়ে রাখি। বহু বছর আগে এখানে ছিল নেটিভ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের বাস। তারপর ১৬৯০ সালে এল ফরাসী বণিকের দল। (লক্ষ্ণীয়, একই বছরে কলকাতায় পা রাখেন জোব চার্ণক) নিউ অর্লিন্স শহরের আনুষ্ঠানিক পত্তন হয় ১৭১৮ সালে। ১৭৬৩

তে ব্রিটেনের সঙ্গে স্প্যানিশদের দীর্ঘ যুদ্ধের পর 'প্যারিস চুক্তি'র মাধ্যমে এই শহর স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর বহুদিন ধরে স্পেন, জার্মান, ফরাসী শাসকদের হাত ঘুরে অবশেষে ১৮০৩ সালে নেপোলিয়ান লুইসিয়ানা রাজ্যটাই বিক্রী করে দেন আমেরিকার কাছে।

শংকর তাঁর 'মানবসাগরের তীরে' বইতে লিখেছেন বিশ্ববন্দিত প্যারিসের সঙ্গে আমাদের কলকাতার আত্মিক মিলের কথা। তাই মনে হয় আমেরিকার বুকে ফরাসী সংস্কৃতির এই পীঠস্থান আমাদের পদে পদে মনে করিয়ে দিচ্ছিল নর্থ কলকাতার সরু সরু গলি, ভিড়ে ঠাসা শ্যামবাজার - হাতিবাগানের রাস্তা আর ঠুং ঠুং ঘন্টি বাজিয়ে চলা ট্রাম।তফাৎ একটাই, এদের হেরিটেজ 'ষ্ট্রীট-কার' সগর্বে ২৪ ঘন্টা হাজারো ট্যুরিষ্ট আর শহরবাসীকে সার্ভিস দিচ্ছে - বেচারা ট্রামের মত শহরবাসীর চক্ষুশূল হয়ে ওঠে নি।এ শহর যেন আমেরিকার মধ্যে থেকেও ভিন্ন চরিত্রের এক জনপদ।

স্ট্রীট কার

আমাদের প্ল্যানমাফিক গ্রে হাউণ্ড বাস ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সকালেই ঘুরে নেব কিছু জায়গা। সেই ভেবেই আমরা বেরিয়েছি দুটো মাত্র ব্যাকপ্যাক সম্বল করে "ট্রাভেল লাইট" নীতিবাক্য মেনে। একটা কারণ, স্যামচাচার দেশে অনেক কিছুর মত হোটেল বুক করার কানুনও 'শিবঠাকুরের আপন দেশ' থেকে যেন আমদানি করা। বেলা তিনটের আগে তোমায় ঘর দেবে না; তবে হোটেল ছাড়ার দিন তোমায় বিদায় হতে হবে সকাল এগারোটার মধ্যে! ধন্য আতিথেয়তা!

যাই হোক, "যস্মিন দেশে যদাচার"! এখন বাস ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে কোন দিকে যাই? পরিত্রাতা - গুগল ম্যাপ! কোন তারিখে মোটামুটি কটা নাগাদ কোথা থেকে কোথায় যাব - এই সমস্ত ইনপুট দিয়ে দিয়ে ফাইল ভর্তি ম্যাপের প্রিন্টআউট কি এমনি এমনি বয়ে আনা? ফাইল থেকে বেরল প্রথম ম্যাপ। রাস্তায় বেরিয়েই চমক।এই প্রথম এখানকার কোনো শহরে দেখলাম ফ্লাইওভারের নিচে ফুটপাতে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ ভিখিরি বা বাউণ্ডুলে নারী-পুরুষ নোংরা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে শুয়ে-বসে আছে। আমরা ম্যাপে রাস্তার নাম দেখতে দেখতে চললাম যে দিকে আমাদের প্রথম ট্রাম, থুড়ি 'ষ্ট্রীট-কার' ধরতে হবে। আমাদের ইতি-উতি চাউনি দেখে এক প্রৌঢ়া এগিয়ে এসে যেচে ম্যাপটা নিয়ে রাস্তা বাতলে দিয়ে নিজের গন্তব্যে চললেন।

Jazz সঙ্গীতের মক্কা এই শহর। তাই এখানকার যে কোনো বাস বা ষ্ট্রীট-কারে সারাদিনে যতবার ইচ্ছে চড়ার Pass -এর নাম Jazz Pass। ষ্ট্রীট-কার দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর। মেহগনি কাঠের ডিজাইন করা বেঞ্চ, পিতলের কারুকাজ, সিলিং-এ নকশাদার বাতি! অবিকল কলকাতার ট্রামের মত ঘন্টি বাজিয়ে রেললাইন ধরে ছোট-বড় নানান রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল ক্যানাল ষ্ট্রীটে। সেখান থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে আমরা পৌঁছাব এখানকার সবচেয়ে সুন্দর আর 'হ্যাপেনিং' জায়গা - জ্যাকসন স্কোয়ারে।

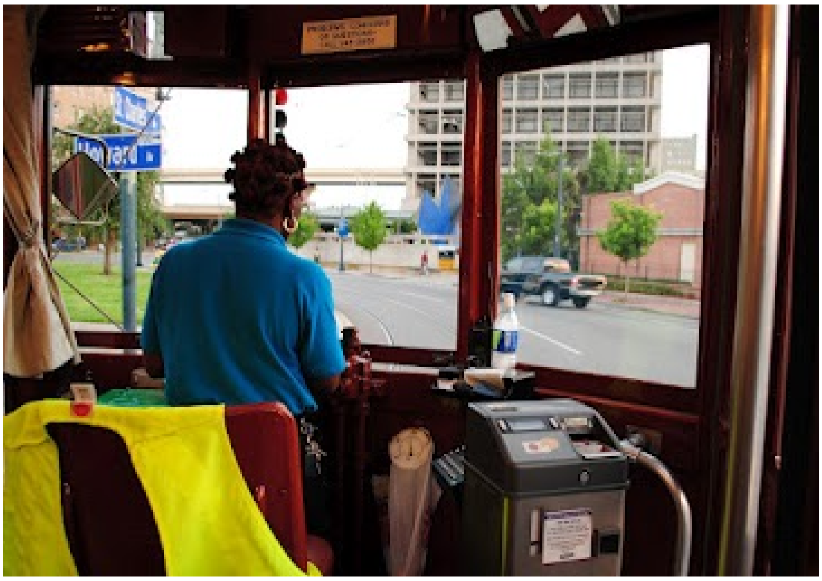

স্ট্রীট কার চালক

ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের সরু সরু গলিপথ ধরে মিনিট পনের হেঁটে জ্যাকসন স্কোয়ারে পৌঁছে দেখি সকাল থেকেই হাজারো ট্যুরিষ্টের হট্টমেলা। সুবিশাল সেন্ট ল্যুইস ব্যাসিলিকার সামনে কী সুন্দর পার্ক। পিঠের বোঝা নামিয়ে সেখানে বসেই জিরিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ।তারপর সেখানেই ঘর থেকে টিফিনবক্সে প্যাক করে আনা লুচি-আলুরদম-সহযোগে প্রাতঃরাশ। সকাল সকাল কোনো আমেরিকান রেস্তোঁরায় জলযোগ করার যন্ত্রণা এড়াতে এটুকু অতিরিক্ত ভার আমরা সানন্দে বহন করেছিলাম।

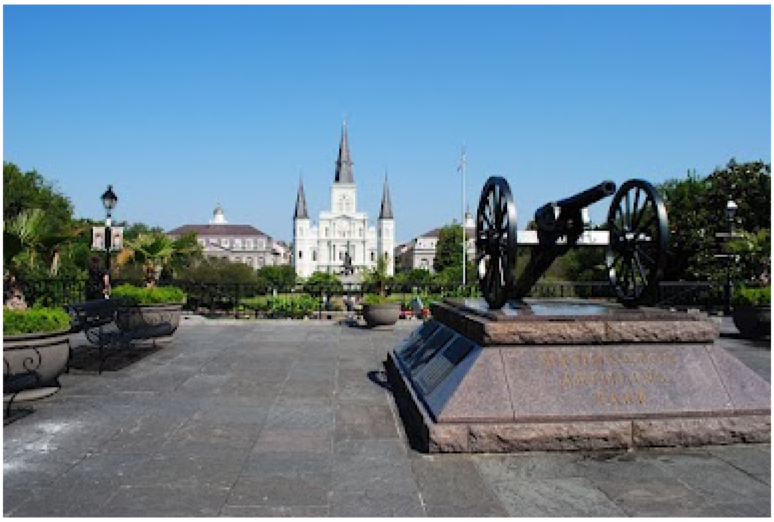

জ্যাকসন স্কোয়ার

জ্যাকসন স্কোয়ার হরেক রকম পসরা সাজায় তার গুণমুগ্ধ পর্যটকদের জন্য। ভাগ্যগণনাকারী টিয়া, Jazz-এর দৈত্যাকার বাদ্যি নিয়ে বাজনদারের দল, ক্যানভাসে রঙ ভরতে ব্যস্ত শিল্পী, হাবিজাবি পুঁতির মালা আর মনিহারী জিনিসের ডালি সাজিয়ে বসা হকার, কিংবা কোনো হোটেল-রেস্তোঁরার বিজ্ঞাপনের বোর্ড হাতে ঘুরঘুর করা ছেলেপিলে - সব মিলিয়ে সদা ব্যস্ত জ্যাকসন স্কোয়ার।আছে আগ্রহী ট্যুরিষ্টের চটজলদি স্কেচ বা কার্টুন এঁকে দেবার শিল্পী। আছে তোমায় নিয়ে টাটকা নতুন পদ্য লিখে দেবার জন্য স্ট্রীট-পোয়েট!

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি একটা সোনালী লোক! তার হাত-পা, জামা-প্যান্ট, মাথার টুপি, হাতের লাঠি এমনকি সানগ্লাসটাও ক্যাঁটকেঁটে সোনালী রঙের। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিচ্ছিল।হঠাৎ রাস্তার মোড়ে এসে একটা পিলারের ওপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অদ্ভুত পোজ দিয়ে বসে পড়ল। তার সামনে একটা বালতি রাখা।পথচলতি লোকজন তাতে ইচ্ছেমতন পয়সাকড়ি ফেলে যাচ্ছে। কেউ আবার এই 'লাইভ স্ট্যাচু'র পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি ক্যামেরাবন্দী করছে।

জীবন্ত স্ট্যাচু

জ্যাকসন স্কোয়ারের এক বিশেষ আকর্ষণ হল "কাফে ড্যু মন্ড" (Cafe Du Monde)। ১৮৬২ সাল থেকে শহরের আড্ডার এই ঠেক বিখ্যাত তার কফি আর ফ্রেঞ্চ ডোনাট "বেনইয়া"র (Beignet) জন্য।

২৪ ঘন্টা অবারিত দ্বার। মেজাজ আর ঐতিহ্যে কলকাতার কফি হাউসের এই ফরাসী সংস্করণে অবশ্য ঢোকার সৌভাগ্য হয় নি - একেবারে হাউসফুল!

কফি হাউস

এখানে ক্যাথিড্রালের পাশেই রয়েছে " প্রেসবাইটিয়ার" - লুইসিয়ানা ষ্টেট মিউজিয়াম। খোলে সকাল দশটায়। ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এখানকার বিখ্যাত কার্নিভাল 'মারডি-গ্রা' (Mardi Gras)-র রঙবেরঙের জমকালো পোশাক পরিচ্ছদ, হরেক রকমের মুখোশ, ব্যবহৃত নানান বিচিত্র জিনিসে ঠাসা মিউজিয়াম। এছাড়া আছে এক বিশেষ প্রদর্শনী - মজার নয়, বরং ঠিক উল্টো। ২০০৫ সালে যে কুখ্যাত হ্যারিকেন ক্যাটরিনায় গোটা লুইসিয়ানা রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার বহু মর্মস্পর্শী মুহূর্তের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ দেখা যাবে এখানে। দেখলাম ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত জনপদের বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমে আবার আজকের নিউ অর্লিন্স গড়ে তোলার চলচ্চিত্র।

মিউসিয়াম

মার্দি গ্রাস শোভাযাত্রার পোষাক

মার্দি গ্রাস শোভাযাত্রার পোষাক

মিউজিয়াম থেকে একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বেরোলাম। রাস্তায় নামতেই কানে এল শাহরুখের হিট ছবির গানের সুর।এক স্ট্রীট-মিউজিসিয়ান তার ট্রাম্পেটে বলিউডি ধুন তুলেছে! পরক্ষণেই খেয়াল হল, বলিউডের কত সঙ্গীত পরিচালকই তো 'মহাবিদ্যা'ধর! তাই অবাক হবার তেমন কারণ নেই।

দুপুরে হোটেলে ফিরে স্নানাহার সেরে ভাতঘুম, থুড়ি, স্যাণ্ডউইচ-ঘুম দিয়ে বিকেল নাগাদ উঠে শুনি অনেক লোকের হৈ হৈ আর বাজনা। হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি এলাহি ব্যাপার। আমাদের হোটেলের পাশেই " লাফায়েৎ স্কোয়ার " নামে একটা বড়সড় সুন্দর পার্ক। দুপুরের মধ্যেই সেখানে বেশ কিছু স্টল, একটা অস্থায়ী স্টেজ বানিয়ে সাড়ম্বরে Jazz Wednesday পালন চলছে। মাঠে গিজগিজ করছে লোক। কোল্ড ড্রিঙ্ক, হট ড্রিঙ্ক, ওয়াইনের স্টল, ধূমায়িত বার-বি-কিউ স্টল - সব তৈরি হয়ে গেছে তাঁবু খাটিয়ে। আছে রঙীন পোস্টার, হাতে আঁকা পেন্টিং (আকাশছোঁয়া দাম!) একটু ভয়ে ভয়ে একটাতে হাত দিতেই স্টলের ভদ্রলোক তেড়ে এলেন - হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো করে ঘেঁটেঘুঁটে দেখ, কোনো

সংকোচ কোরো না!!

লাফায়েত স্কোয়ার এ জমায়েত

লাফায়েত স্কোয়ারে নতুন বন্ধু

লাফায়েত স্কোয়ারে ছবির দোকান

এরই মধ্যে স্টেজে কোনো লোকাল ব্যাণ্ড গলা ছেড়ে জগঝম্প গেয়ে চলেছে। গানের গুঁতোয় আমাদের

কান ভোঁ ভোঁ। ওদিকে নানা রঙের, নানা বয়সের দর্শক-শ্রোতা হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়ে চলেছে। বাপ রে কী স্ফূর্তি!

সন্ধেবেলা সেন্ট চার্লস স্ট্রীট-কার চেপে নগর পরিক্রমা। নিউ অর্লিন্স বেড়াতে এলে অবশ্য কর্তব্য! সেন্ট চার্লস এভিনিউ-এর দুধারে অজস্র ঐতিহাসিক অট্টালিকা - দু'তিনশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন হয়ে। বানানোর স্টাইল অনুযায়ী তাদের আবার নানা ক্যাটাগরি - আমেরিকান টাউনহাউস, শটগান হাউস, ডবল গ্যালারী হাউস আরও কত কী! সন্ধে হতেই রাস্তার

দুধারে ঝলমলে আলোর বন্যা। মানানসই নরম আলোয় সেজে উঠেছে যেন মায়ানগরী। টুং-টাং স্ট্রীট-কার আমাদের নিয়ে চলল নগরের রূপ-দর্শন করাতে।

রাতের আলোয় ঐতিহাসিক বাড়ি

সন্ধেবেলা স্ট্রীটকারের ভেতরে

সন্ধেবেলা স্ট্রীটকারের ভেতরে

পরের দিন সকালে গন্তব্য মিসিসিপি পার হয়ে Algiers Point নামক ভূখণ্ডে পৌঁছান। আধঘন্টা অন্তর অন্তর বিরাট ফেরিবোট ছাড়ে - নিখরচায় যাত্রী পারাপার। অবশ্য এর পাশাপাশি অনেক বাণিজ্যিক ভ্রমণসংস্থার সুন্দর সাজানো ক্রুজের ব্যবস্থা আছে। সে সব সৌখীন জলতরীতে যেতে যেতে আলো-ঝলমল সন্ধেয় লাইভ Jazz মিউজিক সহযোগে পান-ভোজনের রাজকীয় আয়োজন। তা বলে আমাদের নিখরচার ফেরিবোটও কম যায় না! বোটের দোতলা আর তিনতলায় বিরাট ডেক-এ যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। আর একতলায়? সেখানে একে একে উঠল ছোট-বড় মোটরগাড়ি এমনকী ট্রাক পর্যন্ত!

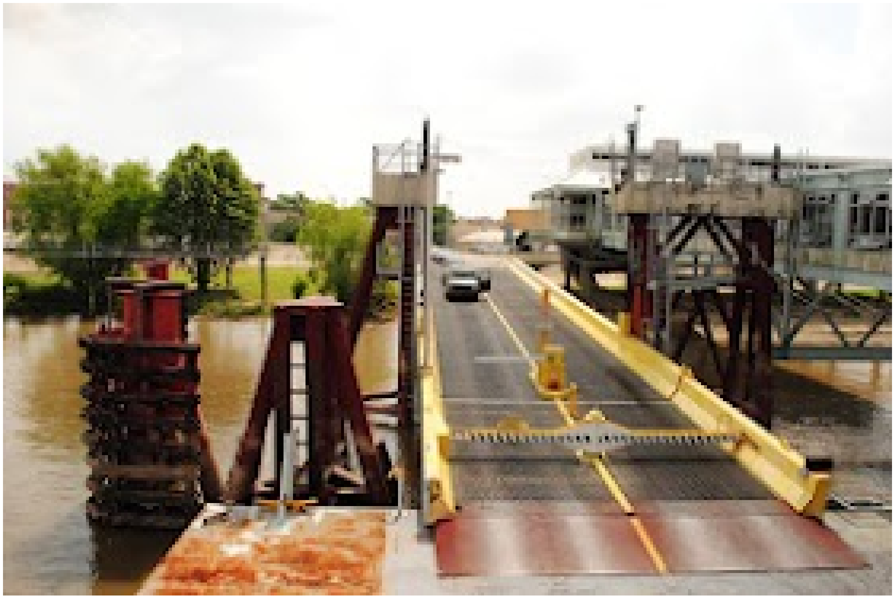

জাহাজে গাড়ি ঢুকছে

Algiers Point এর একটা ইতিহাস আছে। বহুদিন আগে আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে এনে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হত এখানে। সেজন্যই ছবিতে দেখবে Old Algiers এর বোর্ডে লেখা,

"New Orleans' best kept secret"!

অ্যালজিয়ার্স পয়েন্ট

আমাদের ফেরিবোট ছাড়তেই ক্যামেরা তাক করে পটাপট ছবি তোলা শুরু করলাম। পুরো নিউ অর্লিন্স শহরের স্কাইলাইন দেখা যায় মাঝনদী থেকে। মিসিসিপির ওপর লম্বা ব্রিজটা যেন ঠিক আমাদের হাওড়া ব্রিজ! নদী পার হয়ে Old Algiers পৌঁছে চোখে পড়ল কিছু প্রাচীন অট্টালিকা। আর আছে Jazz মিউজিসিয়ান লুইস আর্মস্ট্রং-এর মূর্তি।

মিসিসিপি ব্রিজ

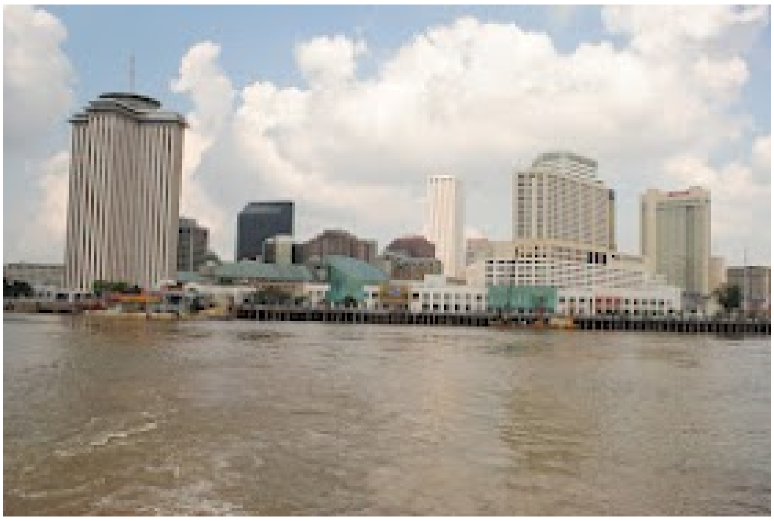

নদীর থেকে দেখা শহর

জ্যাজ মিউজিশিয়ান

দর্শনীয় স্থানগুলো মেটামুটি দেখার পর আমাদের এলোমেলো ঘোরাঘুরি শুরু। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ মার্কেটের দোকানগুলোয় উঁকি-ঝুঁকি মেরে হ্যাংলার মতন স্যুভেনিয়ারের কালেকশন দেখা! পথ চলতে চলতে কিছু রেস্তোঁরার দরজায় ঝোলানো মেনু পড়ে নিচ্ছিলাম। চোখটা আটকে গেল "অ্যালিগেটর ডিশ"-এ! দেখেই তো "আগন্তুক'-এর মনমোহন মিত্রের মত "সর্বভুক" খেতাবটা পাওয়ার জন্য নোলা লকলকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু রূপসী অভিভাবক-সুলভ গাম্ভীর্যে 'ও সব দেখতে নেই' জাতীয় হুংকারে ঐ রেস্তোঁরায় লাঞ্চের প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল। (সেটা অবশ্য আখেরে ভালই হয়েছে। কালই এক সত্যিকারের "সর্বভুক" চাইনিজ ছাত্রীর থেকে জানলাম, অ্যালিগেটরের মাংস চিবিয়ে খাওয়া আর তারপর হজম করা চৈনিক পৌষ্টিকতন্ত্রের কাছেও বেশ মেহনতের ব্যাপার!)

ফ্রেঞ্চ মার্কেটে ভাস্কর্য

রাস্তায় সাইকেল রিকশা

আবার এ-দোকান, সে - দোকান ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক কাউন্টারে দেখি বাঙালি ভদ্রমহিলা! তবে এই শেষ নয়। আরেক দোকানে বাঁকুড়ার এক ভদ্রলোকের দেখা মিলল। তিনি দেশ ছেড়েছেন অনেক দিন আগে। দোকানে খদ্দের ছিল না। ভদ্রলোক মনের সুখে অনেক বছরের জমানো গল্পের স্টক নিয়ে বসলেন। তারপর একটা কাগজে লিখে দিলেন কাছেই কোথায় ইস্কনের মন্দির আছে তার ডিরেকশান। পরের দিন সন্ধ্যারতি দেখতে যাওয়ার নিমন্ত্রণও করে ফেললেন। অবশ্য আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে নি। পরদিন ভোরেই আমাদের ফেরার বাস।

সেইদিনই, অর্থাৎ শেষ সন্ধ্যায় দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল! এক, এখানকার নামজাদা ক্যাসিনোয় ঢুকে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জন। দুই, ইণ্ডিয়ান রেস্তোঁরায় নৈশভোজন। সিনেমার পর্দায় দেখে দেখে ক্যাসিনোর ব্যাপারে অনেকদিনের আগ্রহ জমেছিল। তবে অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়। আধঘন্টা ধরে তিন-চার রকমের স্লটিং মেশিনে বোতাম টিপে টিপে বোর হয়ে আর ডলার-পাঁচেক খুইয়ে বেরিয়ে এলাম। কী আনন্দে লোকে খেলে রে বাবা!

যাইহোক, শেষ সন্ধ্যার ক্যাসিনো-পর্বের চেয়ে ঘন্টাখানেক বাদে শহরের একমেবাদ্বিতীয়ম ভারতীয় রেস্তোঁরা 'নির্বাণা' (Nirvana) -তে বিরিয়ানী পর্বটা জমেছিল খাসা!

লেখা ও ছবিঃ
জ্যোতির্ময় দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পরশমণি: স্থির তড়িতের কথা

একখানা চুম্বককে লোহার তৈরী কোন কিছুর (যেমন সেফটিপিন বা আলপিন) কাছে আনলে চুম্বক তাকে আকর্ষন করে, এটা তোমাদের সাধারন অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটাকি জান যে কাগজের টুকরোকেও কোন কিছু দিয়ে আকর্ষিত করা যায়! দেখেছ কখনও? দেখ নি? তাহলে যা যা বলি করে দেখ, কি হয়। শীতের দিন হলে ভাল হয়, কেননা এই পরীক্ষা করতে গেলে শুকনো আবহাওয়া প্রয়োজন। কেন শুকনো আবহাওয়ার দরকার তা পরে বলছি।

একদিন মাথায় ভাল করে শ্যাম্পু কর, যাতে চুলে তেল না থাকে। আর চিরুনীটাকেও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নাও।

এবার কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দাও। চুল, চিরুনী সব শুকিয়ে গেলে ভাল করে মাথা আঁচড়ে চিরুনীটাকে কাগজ-টুকরোগুলোর কাছে নিয়ে যাও। কি দেখবে বল দেখি? আলপিন যেমন চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হয়, কাগজ টুকরোগুলোও তেমনি চিরুনীর দিকে ছুটে যাবে বা আকর্ষিত হবে। অথচ দেখ চিরুনীটাও চুম্বক হয়নি বা কাগজের টুকরোগুলোও আলপিন হয়ে যায় নি। অবাক ত' হলেই, না কি?

অবাক করা আরও এক আধটা উপমা দিই তাহলে। একটা ছোট বেলুন ভাল করে ফুলিয়ে মুখটা বেঁধে নাও যাতে হাওয়া বেরিয়ে না যায়। এবার ঐ ফোলান বেলুনটা কোন নাইলন বা টেরিলিন কাপড়ে ভাল করে ঘসে নাও।দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের গায়ে বেলুনের ঘসা দিকটা ঠেকিয়ে হাত সরিয়ে নাও। দেখ অবাককান্ড, বেলুনটা পড়ে গেল না, ক্যালেন্ডারের গায়ে সেঁটেই রইল!

এমন উদাহরন অনেক দেওয়া যায়। ব্যাপারখানা বুঝতে পারলে কিছু! এসব আসলে তড়িতের খেলা, যাকে ঠিক করে বললে বলতে হয় 'স্থির তড়িৎ' এর খেলা। স্থির তড়িৎ তাহলে কি রকম?

যখন কোন দু'টি বস্তুকে পরস্পর ঘসা হয় তখন স্থির বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়, যেমন এখানে চুলের মধ্যে চিরুণী, কিংবা বেলুনকে নাইলন কাপড়ে ঘসা হল।

এমন ঘর্ষনে উৎপন্ন তড়িৎকে বলে 'স্থির বিদ্যুৎ', আর এই ব্যাপারকে বলে 'তড়িতাহিত করণ'। এখানে যেমন কাগজ আর চিরুণী দু'টিই তড়িতাহিত হয়ে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছে।

আর দু'চারটে কথা বলে নি। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

তাপ সম্পর্কে বলার সময় বলেছিলাম দু' রকম পদার্থের কথা, যারা কিনা 'সুপরিবাহি' আর 'কুপরিবাহি'।

যারা তাপ পরিবহন করে তারা সুপরিবাহি আর যারা করে না তারা কুপরিবাহি। তেমনি যারা তড়িৎ পরিবহন করে তারা 'পরিবাহী'(conductor) আর যারা তা পারে না তারা 'অপরিবাহী' (non-conductor)। সব চেনা ধাতু এবং অন্যান্য কিছু পদার্থ তড়িতের পরিবাহী। মানুষের দেহ কিন্তু এই পরিবাহীদের দলে, জলীয় বাষ্পও তাই। বেশীরভাগ অধাতু অপরিবাহী। ঐযে চিরুণীর কথা বললাম, সেটা কিন্তু অপরিবাহী। কাগজ, বেলুনও তাই।

যদি ঐ চিরুণীটা যা দিয়ে তৈরী সেই প্ল্যাস্টিক, পলিথিন বা সেলুলয়েডের না হয়ে পিতল বা আলুমিনিয়মের তৈরী হত (চুল কাটার সেলুনে যেমন থাকে), তাহলে কি কাগজকে টানত? একেবারেই না। কারণটা কি জান? কারণ হল, ধাতু পরিবাহী। চুলের সাথে ধাতব চিরুণীর ঘসায় স্থির বিদ্যুৎ তৈরী হয় ঠিকই, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ, পরিবাহী চিরুণী আর তোমার শরীরের মাধ্যমে (শরীরও পরিবাহী) সোজা মাটিতে চলে যাবে, অর্থাৎ নিস্তড়িৎ হয়ে পড়বে। চিরুণী যদি তড়িৎ হারিয়েই ফেলে তাহলে আর আকর্ষণ করবে কি করে!

প্লাস্টিকের চিরুণী অপরিবাহী বলে আমাদের দেহের মাধ্যমে তড়িৎ মাটিতে যায় না, যেখানকার তড়িৎ সেখানেই থাকে। তাই ত' সে চিরুণীর মধ্যে থেকে কাগজের টুকরোকে আকর্ষন করে। তাই বলে কি ঐ তড়িৎ চিরকালই থেকে যাবে নাকি! মোটেই না। একটু পরেই চিরুণী নিস্তড়িৎ হয়ে যাবে, কেননা তড়িৎ বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে বাতাসে চলে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'তড়িৎ মোক্ষণ' হওয়া (leakage of electricity)। ঠিক এই কারণেই ক্যালেন্ডারের সাথে বেলুনও চিরকাল ঝুলে থাকবে না।

ধাতব চিরুণীর যদি একটা অপরিবাহী হাতল থাকে তাহলেই, মানুষের দেহের সাহায্যে তড়িৎ মোক্ষণ হবে না, তড়িৎ চিরুণীতেই থেকে যাবে। তবে একটু পরেই তা নিস্তড়িৎ হয়ে যাবে বাতাসে তড়িৎ মোক্ষনের জন্য। বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প এই মোক্ষনের জন্য দায়ী।

অপরিবাহী পদার্থকে আমরা অন্তরকও বলি। বাড়িতে যে বিদ্যুতের তারের সাহায্যে আলো জ্বালানো হয় (সুইচ আর বাল্বের মধ্যে তারের সংযোগ থাকে), সেই তার রবার, সুতো বা প্লাস্টিক জাতিয় অন্তরক দিয়ে মোড়া থাকে, যাতে অসাবধানে বৈদ্যুতিক তারে হাতের ছোঁয়া না লাগে। তারে হাত লাগলে 'শক' লাগে এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। রাস্তার পাশে যে বিদ্যুৎবাহী তার থাকে সেটা কিন্তু অন্তরক দিয়ে মোড়া থাকে না। তাহলে যে স্তম্ভগুলোর সাহায্যে তারকে একস্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেগুলো ঐ তারের সংস্পর্শে বিদ্যুতবাহি হয়ে পড়ে। আর সেগুলোয় হঠাৎ ছোঁয়া লাগলে শক লেগে যেতে পারে। তাই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে এক ধরনের অন্তরক পর্সিলিনের বাটির সাহায্য নেওয়া হয়, যাতে তারের সাথে আলোকস্তম্ভের সংযোগ হয়ে না যায়। অবশ্য এভাবে খোলা পরিবাহী

দিয়ে তড়িৎ পাঠালে একটা ক্ষতি হতে থাকে, অন্তরকবিহীন তার থেকে তড়িৎমোক্ষণ আটকানো যায় না।

এ ব্যাপারে উঁচু শ্রেণীতে উঠে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

* * * * * *

একটা মজার খেলা দিয়ে লেখাটা শেষ করি।

টেবিলের ওপর দু'খানা বই ১০-১২ সেমি দুরে রাখ। সে দু'খানা যেন ২ সেমির মত উঁচু হয়। এর ওপর একখানা কাঁচের প্লেট রাখ। তবে তার আগে টেবিলের ওপর বই দু'খানার মাঝখানে কিছু কাগজের টুকরো, থার্মোকলের ছোট ছোট বল, সুতোর টুকরো---এই সব রাখতে হবে। এবার নাইলন বা টেরিলিন কাপড় দিয়ে কাঁচের ওপরটা ঘষতে থাক। (সিল্ক বা পশমের সোয়েটার দিয়েও ঘষতে পার, তাতেও হবে)।বন্ধুদের সামনে এটা কর, দেখ না কেমন মজা হয়। ওরা দারুণ অবাক হয়ে যাবে। কি হবে বলতে পার? টেবিলে ছড়ানো ঐ সব জিনিষগুলো ঝট পট উঠে কাঁচের গায়ে সেঁটে যাবে, একেবারে ম্যাজিকের মত।

কেন হল তার কারণটা ত আগেই বলেছি।

সন্তোষ কুমার রায়
অ্যাটলাস মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জানা-অজানা: প্রাণী জগতের খবরাখবর

১। কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি খুব বেশি, তারা খুব হাল্কা গন্ধের মধ্যেও তফাত করতে পারে। মানুষ যে সব জিনিষের গন্ধ চিনতে পারে, তার থেকে ১০০০ লক্ষ গুণ হাল্কা গন্ধ কুকুরেরা আলাদা করে চিনে নিতে পারে।

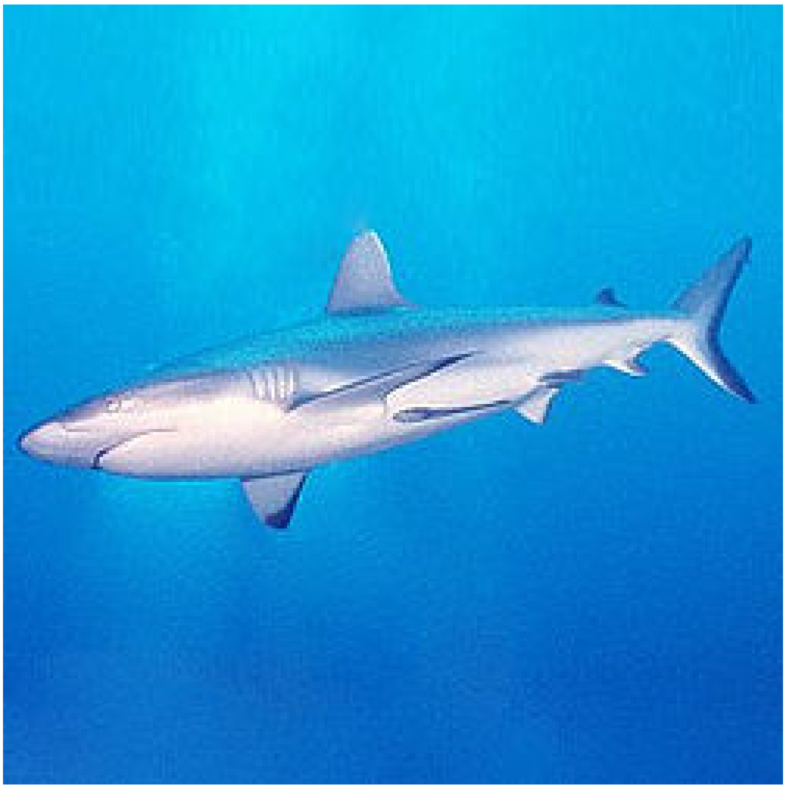

২। হাঙরদের শ্রবণশক্তি প্রখর। তারা ৫০০ মিটার দূর থেকে জলের মধ্যে মাছের ডানা চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পায়।

৩। পেঙ্গুইনের সাদা-কালো পালক সাঁতার কাটার সময়ে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। তাদের পিঠের কালো পালক ওপর থেকে দেখতে পাওয়া কষ্টকপ্র, আর সাম্নের সাদা পালক নিচ থেকে দেখলে মনে হয় জলের মধ্যে সূর্যের আলোর প্রতিফলন হচ্ছে।

৪।প্যান্ডারা হল বিপন্ন প্রজাতি। সংখ্যার নিরিখে সারা বিশ্বে হয়ত মাত্র ২০০০ প্যান্ডা জীবিত আছে।

৫। ঘোড়াদের চোখ যেহেতু তাদের মাথার পাশের দিকে, তাই তারা একবারে প্রায় ৩৬০ডিগ্রি দেখতে পারে।

৬।মনার্ক প্রজাপতিরা তাদের লম্বা পরিযানের জন্য ভিখ্যাত। প্রতি বছর মনার্ক প্রজাপতিরা প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পরিযান করে। গন্তব্যে পৌঁছে স্ত্রীরা ডিম পাড়ে, আর এক নতুন প্রজন্ম উড়ে আবার গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানে ফিরে আসে। এইভাবে তাদের পরিযানের চক্র সম্পূর্ণ হয়।

৭। উটপাখী (অস্ট্রিচ) পৃথিবীর সব থেকে বড় পাখি। তারা পৃথিবীর সবথেকে বড় ডিম পাড়ে আর সবথেকে দ্রুত দৌড়াতে পারে (৯৭ কিলমিটার প্রতি ঘন্টা)।

৮। বাঁদরদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কিস (Old World Monkeys) যারা আফ্রিকা আর এশিয়া তে থাকে; আর নিউ ওয়ার্ল্ড মাঙ্কিস (New World Monkeys) যারা দক্ষিণ আমেরিকাতে বসবাস করে।

ক্যাপুচিন বাঁদরদের মনে করা হয় নিউ ওয়ার্ল্ড মাঙ্কিসদের মধ্যে সবথেকে ধুরন্ধর এক প্রজাতি। তাদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার, নতুন দক্ষতা শেখার আর আত্মসচেতন হয়ে নানারকমের অঙ্গভঙ্গী করার ক্ষমতা আছে।

৯। ক্যাঙারুরা অনেক উঁচু অবধি লাফাতে পারে, অনেক সময়ে তাদের নিজেদের উচ্চতার তিন গুণ।

১০। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে নীল তিমি সবথেকে জোরে আওউয়াজ করতে পারে। ১৮৮ ডেসিবেলের এই আওয়াজ ৮০০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়।

তথ্য সংকলনঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

এক্কা-দোক্কা: অলিম্পিকে ভারতের নক্ষত্ররা

যদিও ২০১২ এর লন্ডণ অলিম্পিক্‌স্‌ বেশ কিছুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এবারের অলিম্পিক ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এবার খেলাধূলা নানা বিভাগে আমরা পেয়েছি ছয়টি পদক। চট করে আরেকবার দেখে নেওয়া যাক, কে কোন বিভাগে আমাদের গর্বিত করেছেনঃ

বিজয় কুমার

২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল শ্যুটিং ইভেন্ট

রৌপ্য পদক (ভারতের প্রথম রৌপ্য পদক)

হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর জেলার বারসার গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলে ভারতীয় সেনার ষোড়শ ব্যাটালিয়নের ডোগরা রেজিমেন্ট এর একজন সুবেদার মেজর। তিনি ২০০৭ সালে অর্জুন পুরষ্কার এবং ২০১১-১২ সালের রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরষ্কার পেয়েছেন।

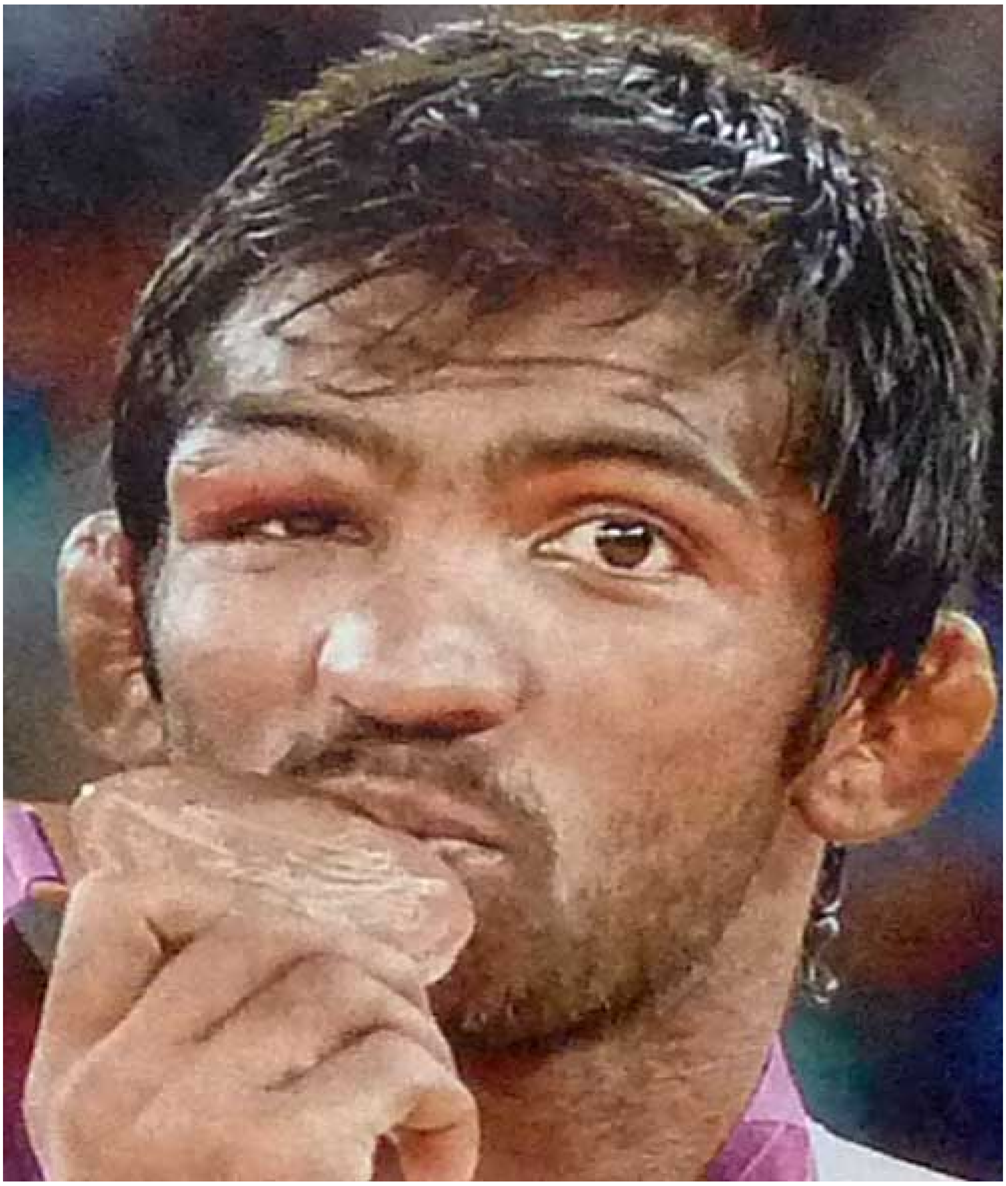

যোগেশ্বর দত্ত
পুরুষদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তি
ব্রোঞ্জ পদক
হরিয়ানার সোনিপত জেলার ভঁইসওয়াল কালানের এই ছেলে আট বছর বয়স থেকে কুস্তি লড়তে শুরু করেন। তিনি ২০১১-১২ সালে রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরষ্কার পেয়েছেন।

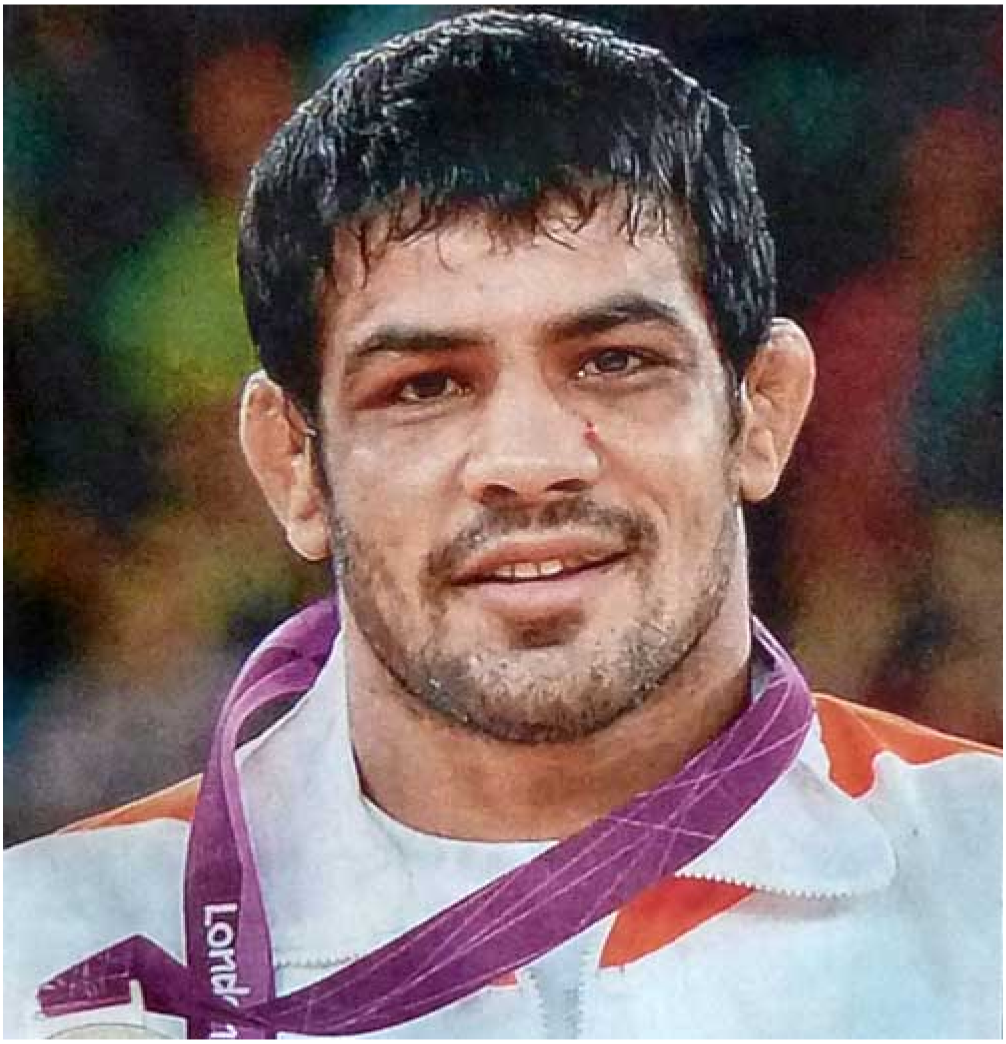

সুশীল কুমার
পুরুষদের ৬৬ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তি
রৌপ্য পদক

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির নজফগড়ের কাছের গ্রাম বাপরোলার ছেলে সুশীল কুমার। তাঁর বাবা ছিলেন ডিটিসি- এর বাস চালক। ২০০৫ সালের অর্জুর পুরষ্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় রেলের এই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ম্যানেজার, ছোটবেলা থেকে যোগেশ্বর দত্তের সঙ্গে এক সাথে দিল্লির ছত্রসালের সতপাল আখাড়াতে কুস্তির অনুশীলন করতেন, আর অলিম্পিকে পদক জেতার স্বপ্ন দেখতেন। ২০১২ সালে দুই বন্ধুর স্বপ্ন এক সাথে পূর্ণ হল।

সাইনা নেহওয়াল
ব্যাডমিন্টন
ব্রোঞ্জ পদক

হরিয়ানার হিসারে জন্ম সাইনার। তিনি বড় হয়েছেন হায়দ্রাবাদে। তার বাবা ডঃ হরবীর সিং এবং মা উষা নেহওয়াল, দুজনেই একদা হরিয়ানার ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বাবা-মাই তাকে খেলতে অনুপ্রাণিত করেন। ২০০৯-১০ সালে তিনি রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরষ্কার এবং ২০১২০ সালে পদ্মশ্রী লাভ করেন।

সাইনা প্রথম ভারতীয় যিনি অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে পদক পেলেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়ার্ল্ড জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে তিনি ২০০৯ সালে সুপার সিরিজ টুর্নামেন্ট জেতেন। ২০১০ সালে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের র‍্যাঙ্কিং এ তিনি বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

এম. সি. মেরি কম
মহিয়ালদের বক্সিং এ ফ্লাইওয়েট (৫১ কেজি) বিভাগ
ব্রোঞ্জ পদক

মণিপুরের চুরাচানপুর জেলার কাঙ্গাথেই এর 'কম' উপজাতির এর ঝুম চাষী পরিবারের এই মেয়ে পাঁচ বার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, আর এক মাত্র মহিলা বক্সার যিনি ছয়টি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটিতে পদক জিতেছেন। ২০০৩ সালে অর্জুন পুরষ্কার, ২০০৬ সালে পদ্মশ্রী, ২০০৯ সালে রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরষ্কার পাওয়া এই মেয়ে AIBA World Women's Ranking Flyweight বিভাগে চার নম্বর স্থানে নির্বাচিত হয়েছেন।

গগন নারাং
১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্ট
ব্রোঞ্জ পদক

হরিয়ানার পানিপথ জেলার সামহাল্কা-এর নারাং পরিবারের ছেলে গগনের জন্ম নয় চেন্নাইতে। তিনি বেড়ে ওঠেন হায়দ্রাবাদে। মাত্র ছয় বছর বয়সে চেন্নাই-এর মারিনা বিচ কার্নিভালে বেলুন ফাটিয়ে তাঁর বন্দুক চালানোর শুরু। ২০১০ সালে পদ্মশ্রী এবং রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরষ্কার পাওয়া এই শ্যুটার নিয়মিত অনুশীলনের সাথে সাথে গভীর মনঃসংযোগে বিশ্বাসী।

২০১২ সালে আরেকজন ভারতীয় যিনি অলিম্পকের দুনিয়ায় আমাদের গর্বিত করেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এই লেখা সম্পূর্ণ হোবে না। তিনি হলেন গিরিশা হোসাঙ্গারা নাগারাজেগৌড়া। বাঁ পায়ে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মানো এই খেলোয়াড় লন্ডনে আয়োজিত ২০১২ সালের প্যারালিম্পিক গেম্‌স্‌-এ পুরুষদের হাই জাম্প F-42 বিভাগে তিনি রৌপ্য পদক লাভ করেন। স্বাভাবিক (প্রতিবন্ধকতাহীন) প্রতিযোগীদের সাথে সমান তালে লড়ে যেতে একফোঁটাও পিছপা নন গিরিশা।

তথ্য সংকলনঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

ছবিঃ
দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা আর ইন্টারনেট